শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক :
স্বামী নির্জরানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ—১৩৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-৭০০০১৫

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। পরবর্তী ভাগের জন্য অনেকের প্রবল আগ্রহে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় ভাগের রচনাশৈলী প্রথম ভাগেরই অনুরূপ। কথামৃতের পরিচ্ছেদগুলি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর দিনপঞ্জী থেকে এক এক দিনের ঘটনার উল্লেখ ক'রে বিবৃত করেছেন, কিন্তু এই বিবরণে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। কথামৃত-প্রসঙ্গ সেই মূল গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা বলে কথামৃতকারের পদ্ধতিই এখানে অনুসৃত হয়েছে।

প্রথম ভাগের মতো দ্বিতীয় ভাগও অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরুণকুমার মিত্রের অনলস প্রযত্নে টেপ থেকে পুনর্লিখিত হয়ে মুদ্রণের উপযোগী হয়েছে। এই ভাগের পাণ্ডুলিপিও উদ্বোধনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ আদ্যোপান্ত সংশোধন ক'রে দিয়েছেন এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে।

আশা করি, এই গ্রন্থটিও প্রথম ভাগের মতো পাঠকদের অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করবে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

এক

কথামৃত—১।১৩।৩

আমাদের অনেকের মনেই যে প্রশ্নটি জাগে, আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথমেই 'কোন্নগরের ভক্ত' সেই প্রশ্নটি করেছেন, "মহাশয় শুনলাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।" প্রশ্নটি মনে হয় হাস্যকর। যে জিনিসের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই, সে বিষয়ে দুচারটি কথা একজনের মুখে শুনলেই কি সে ধারণা স্পষ্ট হবে, অথবা তাঁর কথার তাৎপর্য আমাদের বুদ্ধিগম্য হবে ?

ভাব ও মহাভাব

অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর। তিনি কোন প্রতিবাদ না ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই বোঝাচ্ছেন, ভাবের লক্ষণ কি.। বলছেন, "শ্রীমতীর মহাভাব হ'ত ; সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী ব'লত, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁয়ো না—এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।' এর তাৎপর্য এই যে, ভাবের অবস্থায় ভগবান আর ভক্ত এক হ'য়ে যান। ভক্তের খোলটা থাকে মাত্র, ভিতরে স্বয়ং ভগবান পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করেন। এরই নাম 'মহাভাব'—কারণ অন্য সব ভাব অন্তর্হিত হ'য়ে ভগবদ্ভাবটি এখানে সবচেয়ে পরিস্ফুট। সাধারণ ভক্তদেরও সাধনার পরাকাষ্ঠায় ভাব হয়, কিন্তু সেটি মহাভাব নয়। তাদের হৃদয়ে ভগবানের ভাবটি আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। ঠাকুর বলছেন, মহাভাব জীবের হয় না, শ্রীমতীর হ'ত। কারণ মহাভাব ধারণ করার শক্তি জীবের নেই।

শ্রীমতীর দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, আর কারও মহাভাব হয়নি বা হ'তে পারে না। এর তাৎপর্য এই যে, যার মহাভাব হয় সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না, শ্রীমতীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তার নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়—সে হয় ভগবানের বিলাসক্ষেত্র মাত্র। মহাভাবের সময়ে যে অনুভব করছে, আর যা অনুভব হচ্ছে—এ দুটি আর ভিন্ন থাকে না, এক হ'য়ে যায়। রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে আলোচনা হয়, তার থেকে এই মহাভাবের লক্ষণ কিছুটা বোঝা যায়। মধুরভাবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ বলছেন, আমি আর তিনি—দুজনে মিলে এক হ'য়ে যাই—"না সো রমণ হাম না রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥" (চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ) তখন মনে হয়, কাম প্রেম যেন দুজনের মনকে পিষে এক ক'রে দিলে। কাম অর্থাৎ ভগবানকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—সে আকাঙ্ক্ষায় ভক্ত আর ভগবান—দুজনের মন পিষে এক হ'য়ে যায়। এটি-ই হচ্ছে মহাভাবের চিহ্ন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ নন, শ্রীমতীও স্ত্রী নন। ভগবান ও ভক্ত দুই-এর সত্তা মিলে এক হ'য়ে গিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে, এই ভাব অর্থাৎ মহাভাব ঈশ্বরানুভূতি হ'লে তবেই হয়, যার হয়নি তার পক্ষে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা কঠিন। তবু ঠাকুর দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছেন—"গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে,—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে। তাই 'ভাবে—হাসে কাঁদে, নাচে-গায়'।" সাধারণ ভাবাবস্থা সম্বন্ধেই এ দৃষ্টান্ত, মহাভাব অবধি যেতে হয় না। যখন ভগবানের ভাব এসে মন উদ্বেল করে, তখন নিজের মনের উপর কোন অঙ্কুশ থাকে না। মনকে সে আর আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে না। আর একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্তের সাহায্যে ঠাকুর বলছেন যে "অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে।"

আয়নাব কাছে ব'সে মুখ দেখার অর্থ ভাবাবস্থায় ভগবানের সান্নিধ্যে থাকা। সেই সান্নিধ্যে থেকে আর নিজের মুখ দেখা থাকে না, সেই আয়নাতে প্রতিফলিত হচ্ছে যে আমিত্ব, সেই আমিত্ব আর থাকে না; সেই আমিত্ব তখন সম্পূর্ণরূপে তাঁতে মগ্ন হ'য়ে যায়—নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।

ঈশ্বরদর্শন ও তার লক্ষণাবলী

এরপর কোন্নগরের ভক্ত বলেছেন, "শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।"—এ ভারী সুন্দর কথা। সত্যি তো যিনি ঈশ্বর দর্শন কবেছেন, তিনি যদি না দেখিয়ে দেন, তবে শুধু তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রব কি ক'রে? উপনিষদেও অনুরূপ কথা আছে—'যো বা কশ্চিদ্ ব্রূয়াদ্ বেদ বেদেতি যথা বেত্থ তথা ব্রূহি', (বৃঃ ৩।৭।১)—অর্থাৎ যে কেউ এ-কথা বলতে পারে—আমি জানি, আমি জানি। বেশ যেমন জানো, সেইরকম বলো। ঈশ্বরকে দেখেছি যেমন তোমাকে দেখছি—এ বললেই কি হবে? এই কথার ভিতর কি আর পরখ করার কিছু নেই? আছে। কী আছে? গীতায় আমরা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দেখেছি। যিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর লক্ষণ কি, সেটি সেখানে বলা আছে। সুতরাং যিনি বলবেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন, তাঁর আচরণ সত্যই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মতো কিনা, সেটি বিচার করতে হবে। যদি না করি, তবে সেটি হবে অন্ধ-গোলাঙ্গুলন্যায়। অর্থাৎ অন্ধের চোখ বুজে গরুর ল্যাজ ধরে বৈকুণ্ঠে যাবার মতো। সেইজন্যই ঠাকুরও বলেছেন, 'সাধুকে বিচার ক'রে যাচিয়ে বাজিয়ে নেবে। এমন কি, আমি বলছি বলেই যে মেনে নিতে হবে, তা নয়।' এ কথাটি ঠাকুর বলতে পেরেছেন এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে যাচাই করেছেন। স্বামীজী শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে লড়াই করেছেন—এবং এই লড়াইয়ে ঠাকুরও উৎসাহিত করেছেন। তবে বিচার করতে

করতে যাঁর কাছে মন সম্পূর্ণরূপে সায় দেয়, তখন তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। তখন আর প্রতিপদে মনে সংশয় তুলতে নেই, তাতে সাধনপথে বিঘ্ন হয়। অবশ্য কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকারী-হিসাবে ঠাকুর গুরুর কথা মেনে নিতেও বলেছেন, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কিভাবে বিচার ক'রব? এটি দুভাবে পরীক্ষিত হয়—একটি স্বসংবেদ্য লক্ষণ, অপরটি পরসংবেদ্য। অপরে যখন দেখে শাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে বিচার ক'রে, তখন সেটি পরসংবেদ্য। আর সাধক যখন স্বয়ং বিচারশীল হ'য়ে অন্তর্মুখীন হয়, নিজে বিচার ক'রে যে লক্ষণগুলি বুঝতে পারেন, তখন সেগুলি স্বসংবেদ্য লক্ষণ। কীর্তনাদি শ্রবণ করলে, কিংবা একটু জপ করলে, অথবা দু-চারদিন সাধন করলে অনেকেব দেখা যায় যে অশ্রু, রোমাঞ্চ, কম্প ইত্যাদি হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তার অর্থ ভাব বা মহাভাব নয়। অনেক সময়েই সেগুলি শারীরিক বিকার মাত্র। সুতরাং ঈশ্বরকে দেখেছি বা তাঁকে অনুভব করেছি বা অমুকের ভাবসমাধি হচ্ছে বলেই সে উচ্চ অধিকারী, এ-সব কথা বলার আগে বিচার ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে—মনের অশুচিভাব ক্রমশঃ প্রশমিত হচ্ছে কিনা, বিষয়াসক্তি কমছে কিনা, ভগবানের দিকে অধিকতর আকর্ষণ বোধ করছি কিনা। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাষায়, 'যত পূবের দিকে এগোবে, তত পশ্চিমদিক থেকে দূরে যাবে।' ভগবানের দিকে যেতে যেতে যদি বিষয়াসক্তি না কমে, তবে অন্য যে চিহ্নই শরীরে প্রকাশিত হ'ক না কেন, বুঝতে হবে—তা ভগবানের দিকে যাবার জন্য হচ্ছে না। ভগবানের দিকে যেতে হ'লে ঠাকুরের ভাষায় 'আর সব আলুনি লাগবে।' মন তখন ভগবানে এত ব্যস্ত থাকবে, এত ডুবে যাবে যে আর কোন জিনিস ভাববার অবকাশ থাকবে না। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া 'ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে

খাওয়ার' মতো সহজ জিনিস নয়। দীর্ঘকাল সাধন করতে করতে তবে তাঁর কৃপা হয়। তখন একদিকে তার বিষয়াসক্তি দূর হয়, অপর দিকে ভগবানের উপর তার ভক্তি-ভালবাসা আসে। ভগবানের উপর টান যত প্রবল হবে, তত অন্য বিষয়ে বিরক্তি বা বৈরাগ্য আসবে, ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে তার মনে স্পষ্টতর ধারণা হবে, সংশয় দূরে যাবে।

ভাগবতের একটি শ্লোকে এই অবস্থাটির কথা সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে :

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ (১১.২.৪২)

যেমন একজন অনেকদিন খেতে পায়নি, তাকে যখন খেতে দেওয়া হয়, তখন এক-একটি গ্রাস মুখে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ক্ষুধাজনিত অসন্তোষ দূর হয়, দুর্বলতা দূর হয়, ক্ষুধার যন্ত্রণা শমিত হ'য়ে যায়। ঠিক তেমনি ভগবানের দিকে যে যাবে, যে তাঁর শরণাগত, তারও এই প্রকার অনুভূতি হবে। ভগবানে ভক্তি ভালবাসা আসবে, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হবে, আর ভগবান্ ছাড়া অন্য বিষয়ে বিরক্তি, বৈরাগ্য আসবে। এই হচ্ছে কষ্টিপাথর। অশ্রুপুলকাদি অভ্রান্ত লক্ষণ নয়।

ঈশ্বরদর্শন ও ধৈর্য

কোন্নগরের ভক্তও ঠাকুরকে পরখ করতে চাইলেন, "শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।" ঠাকুর তার কি উত্তর দিচ্ছেন? বলছেন, "সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখনো ধরা পড়ে, কখনো পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার একদিন কিছুই হ'ল না।" ঠাকুরের এ-কথা [illegible]

যাতে আমাদের মনে হতাশা না আসে। বহু সময়ই যখন আমাদের মনে উদ্দীপনা আসে না, মনের মধ্যে তাঁকে দর্শন ক'রে, তাঁকে ভালবেসে যে আনন্দ তা অনুভব করতে পারি না, তখন অধীর হ'য়ে উঠি, অভিযোগ করি 'কিছু তো হচ্ছে না' বলে। সেই অবস্থাটিতেই তাঁর আশ্বাসবাণী—'সবই ঈশ্বরাধীন', তাঁর কৃপার প্রতীক্ষা ক'রে থাকো। বাইবেলের Parable of Ten Virgins-এ এবং পুরাণের শবরী-উপাখ্যানেও সেই প্রতীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। বরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবে ব'লে দশজন তরুণী প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বর আর আসে না। ইতিমধ্যে প্রদীপের তেল শেষ হ'য়ে যাওয়ায় প্রদীপ নিভে গেল। তখন কয়েকজন চ'লে গেল তেল নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু কয়েকজন রয়ে গেল, যদি বর এসে ফিরে যায়। আর সত্যি একটু পরেই বর এল; যে কটি তরুণী ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছিল, তারাই তাকে অভ্যর্থনা ক'রল। শবরীও তেমনি কৈশোর থেকে অপেক্ষা ক'রে আছেন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য। কৈশোর গেল, যৌবন গেল, বার্ধক্য এল, শবরী যখন জরায় জীর্ণ তখন আবির্ভাব হ'ল তাঁর ইষ্ট-দেবতার। ভগবানকে পেলাম না ব'লে সংসারে মত্ত হ'য়ে থাকলে চলবে না। তাঁকে ধ্যান করতে করতে আকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে হবে, এই হ'ল তাঁর কথার তাৎপর্য।

ঈশ্বরলাভ সাধনসাপেক্ষ

ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিন—এ কথার উত্তর কি দিচ্ছেন ঠাকুর? দেখিয়ে অমনি দেওয়া যায় না, তার প্রস্তুতি চাই। তাই বলছেন—"কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়।" একদিন ভাবাবস্থায় হালদার পুকুর দর্শন করেছিলেন, সেই কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন, "যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন

হয় না। ধ্যান, জপ—এই সব কর্ম, তাঁর নাম গুণকীর্তনও কর্ম—আবার দান, যজ্ঞ—এ-সবও কর্ম।" এর মধ্যে দান, যজ্ঞ প্রভৃতি হচ্ছে বৈধ কর্ম। প্রথমোক্ত কর্মগুলি আরো অন্তরঙ্গ সাধন। এই কর্মের দ্বারা তো ঈশ্বর লাভ হয় না, ঈশ্বর লাভ হয় একমাত্র তাঁর কৃপায়। 'সবই ঈশ্বরাধীন'—বলেছেন এর আগে। তবে কর্ম কেন? কারণ মানুষ কখনো কর্মছাড়া থাকতে পারে না, আর ভগবান যদি সত্য সত্য আমাদের কাম্য হন, তবে যে কর্ম তাঁকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই করা কর্তব্য। এ-বিষয়ে অন্যত্র ঠাকুর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—একজন চোর চুরি করতে গিয়ে দেখে যে, সে সিঁদ কেটে ভুল ঘরে এসেছে। সে ঘরে সোনা নেই। সোনা আছে পাশের ঘরে। চোর তখন কি করবে, চুপ ক'রে থাকবে, না ঘুমিয়ে পড়বে? তার প্রাণ তখন তোলপাড় করবে, কোন রকম ক'রে দেওয়ালটা ছিদ্র ক'রে সেই সোনার তালটা সংগ্রহ করবার জন্য। তেমনি প্রকৃতই যে ভগবানের দর্শন চায়, সে তাঁর কৃপা হবে ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। সে অস্থির হ'য়ে, ব্যাকুল হ'য়ে ছটফট করতে থাকে ও যাতে তাঁকে লাভ করা যায়, সেই রকম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে। তাই ঠাকুর বলছেন, কর্ম চাই। "মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাততে হয়। তারপর নির্জনে রাখতে হয়। তারপর দই বসলে পরিশ্রম ক'রে মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।" সুতরাং দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, সাধন ভজন ক'রব না, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থাকব, তা হয় না। একটু পরে তাই ঠাকুর বলেছেন, "এ তো ভাল বালাই হ'ল! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো।"

কিছু না ক'রে চুপ ক'রে বসে থেকেও যে হয় না, তা নয়, কিন্তু সে অত্যন্ত কঠিন কথা। সে-অবস্থায় নিজের কোন ব্যক্তিত্ব নেই, কোন

কর্তৃত্ব নেই। সর্বাবস্থায় নিজেকে জানতে হবে অকর্তা, আমি সেখানে দ্রষ্টা মাত্র, সাক্ষী মাত্র, যন্ত্র মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ-ভাব রাখা কখনই সম্ভব নয়। তাঁকে ডাকার সময় 'তিনি করালে ক'রব' এ ভাবটি ঠিকই আসে, কিন্তু আর সব বিষয়ে কখন যে তার কর্তৃত্ব-ভাব, অহং-ভাবটি চাড়া দিয়ে ওঠে, তা খেয়াল থাকে না, আর সেইখানেই হয়—মনের সঙ্গে বিরাট জুয়াচুরি। তাই আমাদের মতো সাধারণের জন্য তাঁর নির্দেশ—'কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়।'

ঠাকুর যখন কর্মের কথা বলছেন, তখন মহিমাচরণ উত্তর দিলেন—"আজ্ঞা হাঁ, কর্ম চাই বই কি! অনেক খাটতে হয়, তবে লাভ হয়। পড়তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!" ঠাকুর তখন বলছেন, "শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।"

শাস্ত্র, শরণাগতি ও শ্রীগুরু

এখানে প্রধান কথা গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, যার অর্থ শ্রদ্ধা। শুধু বিচার ক'রে কি হবে? বিচারের দ্বারা যখন তাঁকে জানবার চেষ্টা করি, তখন খালি কতকগুলি বুদ্ধির কসরৎ করি মাত্র। তাঁর স্বরূপকে এই বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায় না, অথচ বুদ্ধি ছাড়া আমাদের কোন যন্ত্র নেই, যা দিয়ে বুঝতে পারি। সেই জন্যই বলা হয়েছে 'এই বুদ্ধি'র দ্বারা বুঝতে পারি না। শাস্ত্রেও এই রকম বিপরীত উক্তি আছে, মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, 'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্'। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, মনের দ্বারাই তাঁকে জানতে হবে—'মনসৈবেদ-

মাপ্তব্যম্'—এই পরস্পরবিরোধী উক্তির তাৎপর্য, তিনি এই মন-বুদ্ধির অগোচর হলেও শুদ্ধ মন বা শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। মন বা বুদ্ধি শুদ্ধ হ'লে তবেই তাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রতিভাত হয় এবং অনন্ত শাস্ত্রের জ্ঞানও তার জন্য প্রয়োজন নয়। কারণ হাজার বিচার করলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া', 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' প্রয়োজন—গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রে বিশ্বাস, প্রয়োজন—শুদ্ধা বুদ্ধি। যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াবে, যদি তারই মধ্যে ভূত থাকে তো ভূত তাড়াবে কি ক'রে? তেমনি যে বুদ্ধি দিয়ে শাস্ত্রের মর্ম বুঝবে, তা যদি শুদ্ধ না হয়, তবে পড়ে কি লাভ? মহিমাচরণের পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল বলেই বিশেষ ক'রে তাঁকে ঠাকুর শাস্ত্র-পাঠের নিষ্ফলতার কথা ব'লে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতার উপর জোর দিলেন। বললেন, "বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো-হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম। তখন সব স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে; 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে। সমুদ্র দূর হ'তে হো-হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে—দেখতে পাবে। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।"

এইভাবে ঠাকুর বার বার তাঁকে জানার উপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা তা হয় না। অনন্ত শাস্ত্র, তাতেও পরস্পর-বিরোধী উক্তি, কে তার সামঞ্জস্য করবে? শাস্ত্রে সার ও অসার পদার্থ মিশে আছে—যেমন চিনি ও বালি মিশে থাকে। তাই বলছেন, একান্তভাবে শরণাগত হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনিই তাঁর স্বরূপ জানিয়ে দেবেন। সেই জানাটি তখন শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি—তিনটি মিলিয়ে নিতে হবে। শাস্ত্র

হ'ল শ্রুতি, সেটি যুক্তি বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কিনা, এবং তা উপলব্ধির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কিনা—এটি দেখার জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। তাই বলছেন, "শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে?" যে মন দিয়ে আমি জানব, সে মনই যদি অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত অথবা মলিন হ'য়ে থাকে, তার দ্বারা কি ক'রে সত্য উদ্ঘাটিত হবে? তাই আগে মনকে বিকারমুক্ত করা প্রয়োজন এবং তারই উপায় স্বরূপ বলছেন, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর।' 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস'—এই হ'ল গোড়ার কথা। বিশ্বাস না থাকলে কিসের সাধন করবে? যে শ্রদ্ধাহীন সে কোন দিকেই এগোতে পারে না। শ্রদ্ধা যেখানে নেই, সেখানেই এটা নয়, ওটা নয়, সেটা নয়—সর্বত্রই সংশয়, একটা 'না'-এর সমষ্টি। সুতরাং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' অবস্থা। সাধনের প্রথম পর্যায় এই শ্রদ্ধা। তারপর সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর নির্দেশ নিষ্ঠাভরে পালন করা সাধনের দ্বিতীয় পর্যায়।

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি অশুদ্ধমনে শাস্ত্রপাঠ ক'রে যে জ্ঞান লাভ করে, তাকে ঠাকুর তুলনা করেছেন সমুদ্রের 'হো-হো' আওয়াজের সঙ্গে অথবা দূর থেকে ভেসে-আসা হাটের গোলমালের সঙ্গে। হাটের বিভিন্ন বিচিত্র শব্দ জড়িয়ে যে একটা অর্থহীন আওয়াজ হয়, অথবা সমুদ্রের 'হো-হো' শব্দের যেমন কোন তাৎপর্য নেই, অশুদ্ধ মনে শাস্ত্র পড়লেও তেমনি তার কোন স্পষ্ট প্রতীতি হয় না। ধর্মের স্বরূপ হচ্ছে 'নিহিতং গুহায়াম্'—তা এই বুদ্ধির অগোচর। গবেষক পণ্ডিতরা বড় জোর শাস্ত্র পড়ে তার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে পারেন, এই পর্যন্ত। কারণ কথাই আছে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' অতএব 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' এই নীতি মেনে নিয়ে যাঁরা শাস্ত্রের পারে গিয়েছেন, পরমতত্ত্বে পৌঁছেছেন, তাঁদের নির্দেশ শ্রদ্ধাভরে মেনে চলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য, এ-কথাই ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন।

ঠাকুর বলছেন, "তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।" এ-কথার দ্বারা ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভগবদ্-দর্শনের দ্বারা যে তত্ত্বের অনুভূতি হয়, তা বই পড়ে হয় না। বই মানুষের বুদ্ধির বিন্যনি। সায়েন্স বুদ্ধিগম্য বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের খবরই সায়েন্স দিতে পারে, অতীন্দ্রিয় জগতের খবর দিতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্দর্শন বা ঈশ্বরানুভূতি হ'লে এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তু তুচ্ছ হ'য়ে যায়। অবশ্য যার ঈশ্বর দর্শন হয়নি, তার পক্ষে এই তুচ্ছতার পরিমাপ বোঝা সম্ভব নয়, কারণ জাগতিক ঐশ্বর্য সবই আমাদের সায়েন্সের কৃপায়। আর শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ঠাকুর অন্যত্র বলছেন, পাঁজিতে লেখা আছে বিশ আড়া জল হবে, তা পাঁজি নিংড়োলে এক ফোঁটাও পড়ে না। শাস্ত্রে বহু বিষয়ই লেখা আছে সত্য, কিন্তু নিছক পড়ে গেলে তা থেকে কোন রসই পাওয়া যায় না। বাৎসল্য-রস সম্বন্ধে বই-এ অনেক কিছু পড়া যায়, কিন্তু নিজের সন্তানটিকে আদর ক'রে যে রসের অনুভূতি হয়, তার কাছে বই-এ পড়া জ্ঞান তুচ্ছ। তবে নিজে একবার বাৎসল্য-রস অনুভব করলে যেমন দেখা যায় যে তা বই-এর লেখার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তেমনি ঈশ্বরানুভূতি হ'লে সেই অনুভূতিগুলি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় এবং শাস্ত্র থেকে রস আহরণ করা যায়।

সহজ উপায় : ব্যাকুলতা ও নির্জনবাস

নিজের উপলব্ধিই হ'ল আসল কথা, সেখানে পুঁথিগত বিদ্যা তুচ্ছ; 'তত্র···বেদা অবেদাঃ'—তাই ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন, "বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক-খানা বাড়ি, ক-টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ—এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে!

কিন্তু যো-সো ক'রে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙিয়েই হোক—তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর, দ্বারবান্ সব সেলাম করবে।" কিন্তু ঠাকুর তো অতি সহজেই বললেন, "বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার।" কিন্তু আলাপ করি কি ক'রে? তাই ঠাকুর তারও উপায় নির্দেশ ক'রে বলছেন, "নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর; 'দেখা দাও' বলে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো। কাম-কাঞ্চনের জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো; তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে অমুক ঈশ্বরের জন্য পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো।" বেশীদিন বললে তো কেউ ডাকবে না, তাই ঠাকুর বলছেন, দিন কতক না হয় তাঁকে একলা ডাকো। আলাপ করবার জন্য বহু অনুষ্ঠান, যাগ, যজ্ঞ, তাতে হাজার হাজার টাকা খরচ, শরীরের কৃচ্ছ্র সাধন কিছুই বললেন না। বললেন শুধু একটি কথা, 'নির্জনে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকো।' কিন্তু এই ব্যাকুলতাটুকু আন্তরিক হওয়া চাই। কথার কথা নয়, অন্তরের সঙ্গে ডাকা চাই। আগ্রহ থাকা চাই। উপায়টি শুনতে খুবই সহজ, কিন্তু আমাদের যে গোড়াতেই গলদ, নির্জনে যাবার তো অবকাশ নেই, আর কান্নাও আসে না। কি ক'রে তাঁকে পাব? কবীরও সেই কথা বলেছেন—'খোজী হোয় তো তুরতৈ মিলি হৌঁ, পল-ভর্‌কী তালাস মেঁ।' এক পল বা এক মুহূর্ত যদি তুমি চাও আমাকে, তা হ'লে তখনই আমি এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। এই একাগ্র একান্তভাবে তাঁকে চাওয়া, এটিই আমাদের দ্বারা হয় না। এরই জন্য অভ্যাস করতে বলেছেন, নির্জনে ডাকতে হবে। 'নির্জন' বলেছেন, যেখানে মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হবে না। সাহারা মরুভূমি, কি গভীর অরণ্য, যেখানে বাঘ-ভাল্লুকের বাস, সেই অরণ্যকে নির্জন

বলছেন না। যেখানে এমন জন নেই যে মনকে টানবে, সেই স্থানই নির্জন। যাঁরা আন্তরিক ভাবে ভগবানের চিন্তা করেন, সাধনা করেন, তাঁদের সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে। যেমন হয়তো মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে বসেছে, এমন সময় ছেলেটি আঘাত পেয়ে কেঁদে উঠল—মায়ের সব মন চলে গেলে তার দিকে। অপরাধ ছেলের, না আমার মনের? চারিদিক দিয়ে সে যেন কান পেতে আছে, ভগবান ছাড়া কোন্‌দিক থেকে ডাক আসে। সুতরাং মনের এই অবস্থায় তাকে একান্তভাবে ভগবানের দিকে নিযুক্ত করা, প্রেরিত করার চেষ্টা সার্থক হয় না, অথবা বলা যায় চারিদিকের বিক্ষেপের জন্য চেষ্টা করাই হয় না। এই জন্যই নির্জনতার প্রয়োজন। কিন্তু শুধু তো নির্জনে গেলে হবে না, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে হবে। অনেকে নির্জনে থাকে, কিন্তু তাদের মনে ভগবানের কথা ওঠেই না। সে নির্জনতা এদিক দিয়ে তার কোন কাজে লাগছে না। সে সেটাকে শান্তি ব'লে মনে করে। তাই নির্জনতা শুধু নয়, ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদব কি ক'রে?—এ প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাই বলছেন, 'কেন, বিষয়ের জন্য, সংসারের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদতে পারো, আর ভগবানের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে না?' ঘটি ঘটি কান্না সে তো আসেই। উপায় নেই, মন সে-ভাবেই তৈরী। তাই তিনি বলছেন, যে মন বিষয়ের জন্য এত ব্যস্ত, এত পাগল, সে মনকে ভগবানের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। বিষ্ণু-পুরাণে প্রহ্লাদ বলছেনঃ

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ (১।২০।১৯)

অবিবেক অজ্ঞান ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি যে অশেষ প্রীতি, হে প্রভু, যখন আমি তোমার চিন্তা ক'রব, তখন যেন তোমার প্রতি আমার সেই রকম

প্রীতি আসে। ঠাকুর বলেছেন, ওতেও হবে না, আরো চাই। তিন টান যদি এক হ'য়ে ভগবানের দিকে যায়, তবে তাঁকে পাওয়া যায়—বিষয়ীর বিষয়ের দিকে টান, সতীর পতির উপর এবং মায়ের সন্তানের উপর টান। যে বিষয়ের অনুভব নেই, তার দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যায় না। এই তিন টানের অনুভব মানুষের আছে, তাই এই দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাতমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

অভ্যাস ও সাধন

সবাই চায়—এর থেকে কোন সহজ পথ, একটা কৌশল, কি একটা মন্ত্র, যার সাহায্যে মনটা চট ক'রে তাতে লগ্ন হয়। কিন্তু তা হবার নয়। এমন কোন জলপড়া নেই, যার দ্বারা মনটা একেবারে একাগ্র হ'য়ে যাবে। যদি থাকত, হয়তো ভগবান্ অর্জুনকে সে ব্যবস্থা ব'লে দিতেন। কিন্তু তিনিও বলছেন, মন সত্যই অত্যন্ত চঞ্চল, তবে তাকে স্থির করার উপায় হচ্ছে—অভ্যাস আর বৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থাৎ বারবার চেষ্টা, আর বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয়াদি যা মনকে টানছে, তাকে তুচ্ছ করা। তা হ'লে মন আর সেদিকে যাবে না। এই একমাত্র উপায়। এছাড়া আর পথ নেই। ঠাকুর বলছেন—"শুধু 'তিনি আছেন' ব'লে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল—মাছটা ধপাং ক'রে উঠল। যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ।" ভগবান আছেন ব'লে ব'সে না থেকে তিনি যদি সত্যি কাম্য হন, তা হ'লে তাঁকে খুঁজতে হবে, তাঁকে পাবার যে প্রণালী আছে, তা অবলম্বন ক'রে এগোতে হবে। "দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে।" অবশ্য আমরা

জানি ঠাকুরের অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তি ছিল, তিনি ইচ্ছামাত্র ভক্তদের সব দিতে পারতেন, কিন্তু সে সাধ্য আর কার আছে? তাছাড়া কেউ যদি নিজে কিছু করতে না চায়, তার মানে তার প্রয়োজন-বোধ বা আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে মনে জাগেনি। আহা, ভগবানকে পেলে বেশ হয়, যখন তিনি হাতের মুঠোয় এসে যাবেন, তখন সংসারটা গুছিয়ে নিতে পারি—এই ভাব। তাঁকে কেউ চাইছি না, জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ব'লে মনে করছি না, উপায় ব'লে মনে করছি। ভগবান হাসেন, তোমার কর্মফলে তুমি বাঁধা প'ড়ছ, আমি আর কি ক'রব?

এই কর্মফল আমাদেরই সৃষ্টি। চারিদিকে বাসনার জাল বুনে আমরা নিজেরাই তার মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছি। জাল কেটে বেরোবার পথ আছে, কিন্তু বেরোবার ইচ্ছা নেই। ঠাকুর যেমন বলেছেন, ঘুনির ভিতর মাছ ঢোকে। ইচ্ছা করলে যে পথ দিয়ে ঢুকেছে সেই পথেই বেরোতে পারে, কিন্তু বেরোয় না, মনে করে পথ নেই। আমরা বহু বাসনায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলছি, বাসনা অপূর্ণ থাকছে, আমরাও আর সংসারের বন্ধন থেকে বেরোতে পারছি না। ঠাকুর তাই আবার বলছেন, সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন, একটা ক'রে দেউড়ি তো পার হ'তে হবে। কিন্তু আমাদের সে ধৈর্য কোথায়? আমরা বলি, এইতো সাতদিন ধ'রে ভগবানকে ডাকলাম, কোথায় তিনি? যেন এমন বাঁধাধরা চুক্তি ছিল যে, সাতদিন তাঁর নাম করলে তিনি এসে উপস্থিত হ'য়ে যাবেন। যদি তাঁকে অন্তরের সঙ্গে চাইতাম, তা হ'লে জীবন ভোর তাঁর জন্য প্রাণপণ খাটলেও মনে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে। আমরা ভাবি—অন্যান্য জিনিস তো আমরা চেষ্টা করে পাই, কিন্তু তাঁকে তো চেষ্টা ক'রেও পাই না। আমাদের খেয়াল থাকে না যে আমাদের চেষ্টাটাই আন্তরিক নয়। তাঁকে কি বাতাসের মতো আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে হয়? তাঁকে না পেলে কি আমাদের দম বন্ধ হ'য়ে

আসে? তাঁকে পাবার জন্য মুনি-ঋষিরা খেটে খেটে শেষ হয়েছেন, আর আমরা ভাবি '১০৮বার জপ করতে করতে অনেক সময় যাবে, কম করলে হয় না?' এর নাম কি 'যথেষ্ট চেষ্টা'? তাঁকে ছাড়াও আমাদের দিন চলে যাচ্ছে, তাই আমাদের বেশী দাম দেবার প্রবৃত্তিও হয় না, তাঁকে আমরা তাই লাভও করি না। গুরুবাক্যে বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ক'রে আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে যে চেষ্টা করে, সে অবশ্যই পায়।

ব্যাকুলতা ও কৃপা

ঠাকুর এর আগেই বলেছেন, "তাই কর্ম চাই।" মহিমাচরণ এবার প্রশ্ন করছেন, 'কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?' তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন, "এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ-কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।" এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমার উপদেশও স্মরণীয়। একজন ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'মা, জপ করলে হয়?' অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হয়? মা বলছেন 'না'। 'ধ্যান করলে হয়?'—'না'। 'তবে কিসে হয়?' 'তাঁর দয়া হ'লে হয়।' তাঁর দয়া ছাড়া কেবল এই কর্মগুলির সাহায্যে তাঁকে লাভ করা যায় না। তিনি এমন দুর্লভ বস্তু যে, তাঁকে লাভ করার মতো সাধনা করার সামর্থ্য আমাদের নেই। যতই সাধনা আমরা করি, তাঁকে পাবার পক্ষে তা অতি অকিঞ্চিৎকর। এই কথাটি মনে থাকলে আর কারো সাধনার অহংকার মনে আসতে পারে না। সাধনার অহংকার বড় ভয়ংকর। আমি এত জপ করি, এতক্ষণ ধ্যান করি— এই অহংকার সাধকের সমস্ত সাধনাকে নিষ্ফল ক'রে দেয়। তাই বলছেন, তাঁর কৃপা হ'লে হয়। আর ব্যাকুলতা থাকলে তবেই তাঁর

কৃপা হয়। তাই ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। আর ব্যাকুলতা থাকলে তিনিই সুযোগ ঘটিয়ে দেন—'সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ, হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিল; হয় তো স্ত্রীটি বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্মিক; কি বিবাহ আদপেই হ'ল না, সংসারে বদ্ধ হ'তে হ'ল না—এই সব যোগাযোগ হ'লে হ'য়ে যায়।" অর্থাৎ যে একান্তভাবে তাঁকে ডাকে, তিনি তার সব অনুকূল ক'রে দেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর শরণাগত হ'লে সকল প্রতিকূলতা দূর হ'য়ে যায়। এই বিষয়ে ঠাকুর এখানে একটি চমৎকার গল্প বলছেন: একজনের বাড়িতে ভারী অসুখ, যায় যায়। তখন কেউ বললে, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল যদি মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে, আর সেই সময় একটা সাপ যদি ব্যাঙকে ছোবল মারতে যায় ও ব্যাঙটা পালিয়ে যাওয়ায় সাপের বিষ সেই মড়ার খুলিতে পড়ে, সেই বিষ দিয়ে ওষুধ তৈরী করলে সে বাঁচবে। তখন যার বাড়িতে অসুখ সেই লোক দিনক্ষণ দেখে ওষুধের খোঁজে বেরোল ও ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল। সত্যই স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল যখন মড়ার খুলিতে প'ড়ল, তখন তার ব্যাকুলতা আরো বাড়ল। আস্তে আস্তে ব্যাঙও এল, সাপও ব্যাঙকে তাড়া ক'রল। লোকটি তখন শেষ যোগাযোগটির জন্য এত ব্যাকুল হ'ল যে তার বুক দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগল। প্রাণপণে সে ভগবানকে ডাকতে লাগল, আর সত্যি মড়ার খুলির কাছে এসে ব্যাঙটা যেই লাফ দিল তাকে ছোবল দিতে গিয়ে সাপের বিষও প'ড়ল মড়ার খুলিতে। প্রাণে যে কোন বিষয়েই যদি ব্যাকুলতা থাকে, তবে এই ভাবেই যোগাযোগ ঘটে যায়। গল্পটি বলে ঠাকুর বলছেন, "তাই বলছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হ'য়ে যায়।" তাঁর কৃপার অন্য কোন শর্তাদি নেই। কিন্তু যদি কেউ তাঁর জন্য আন্তরিক ব্যাকুল হয়, তিনি তাকে কখনও নিরাশ করেন না। যেমন ঠাকুর অন্যত্র দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, ছেলেরা খেলনা নিয়ে ভুলে থাকে,

খেলায় মত্ত থাকে। মা নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজকর্ম করেন। কিন্তু যখন ছেলে সব খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে, তখন মা দুম্ ক'রে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে এসে ছেলেকে কোলে নেন।

দুই

কথামৃত—১।১৩।৪

ত্যাগ : প্রকৃত অর্থ ও আচরণ

এখানে ঠাকুর ভক্তদের ত্যাগের প্রসঙ্গে উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও গৃহীর ক্ষেত্রে ত্যাগের আদর্শ ভিন্ন বলছেন। সাধুর ক্ষেত্রে তিনি বলছেন, "মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় করতে পারে না। 'সঞ্চয় না করে পন্‌ছী আউর দরবেশ'।" নিজের কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন, "হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা ক'রে পান আনবার যো নাই।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্যাগের ভাব। তারপরেই মহিমাচরণ প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তদের লক্ষ্য ক'রে বলছেন, "তোমরা সংসারী, তোমরা এও কর, ওও কর। এই ভাবের কথাই তিনি অন্যত্রও বলেছেন, এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে রাখো, আর এক হাতে সংসার কর। এক হাতে খুঁটি ধ'রে থাকো, তা হ'লে আর পড়ে যাবার ভয় থাকবে না। উপদেশের এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সংসারীদের প্রতি কি ঠাকুরের এটি স্তোকবাক্য? সংসারে থেকে কি ভগবান লাভ করা যায়? অথবা ঈশ্বরের দিকে যার মন গেছে, তার পক্ষে কি আর

সংসার করা সম্ভব হয়? মহিমাচরণ সেই সন্দেহই প্রকাশ করছেন। "এ, ও কি আর থাকে?" কিন্তু এটা স্তোকবাক্য নয়। ঠাকুর কখনই কাকেও স্তোক দেন নি, যা সত্য তাই বলেছেন। এক্ষেত্রে তা হ'লে তাঁর এ-কথার কি তাৎপর্য? পরিহাসচ্ছলে ঠাকুর প্রথমে উত্তর দিচ্ছেন—"গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল।··· মা-লক্ষ্মী যদি খাঁাট বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে কি হবে। তখন হাজরার মতো পাটোয়ারী করলুম। বললুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো!" এই রঙ্গ-রসের মাধ্যমে তিনি এটাই বোঝাতে চাইছেন যে, প্রথমেই সর্বত্যাগ করা খুব কঠিন। যতক্ষণ দেহবোধ আছে, ততক্ষণ সমস্ত ত্যাগ সম্ভব নয়।

এ-প্রসঙ্গে ঠাকুরেরই অন্যতম ত্যাগী সন্তান সারদানন্দ মহারাজের একটি রঙ্গ-রহস্যময় উক্তি আছে। উদ্বোধনে একবার এক ভক্ত তাঁকে বললেন যে, তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। মহারাজ তাতে উত্তর দিলেন—'বাবা, আমি এখনো সংসার ত্যাগ করতে পারিনি, এই দেখনা কত জড়িয়েছি।' এই ব'লে তিনি তাঁর গায়ের গরম জামা-কাপড়গুলির দিকে ইঙ্গিত করলেন। শীতের দিন আর তাঁর বাতের শরীর, বেশ কিছু গরম জিনিস তিনি সত্যই গায়ে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত বক্তব্য ছিল এই যে, যতক্ষণ দেহ আছে, দেহেতে মন আছে, দেহের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ ত্যাগ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুরও সেইজন্য বলছেন, "তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—অনাসক্ত হ'য়ে সংসার কর।" এটি স্তোকবাক্য নয়—সাধনেরই ইঙ্গিত। কথাটি পরিষ্কার ক'রে বলছেন, "মন থেকে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বরে মন যায়।··যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হ'তে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ, নিকৃতির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন, যখন নিকৃতির বাটিতে কাম-কাঞ্চনের ভার পড়ে।" ভাব

হচ্ছে এই যে—সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে? দেহ যতক্ষণ রয়েছে, এই সংসারও ততক্ষণ আছে। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী—সকলেরই এই দেহকে পালন করতে হবে। কারণ যদি কেউ সাধন করতে চায় তারও এই দেহের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সিদ্ধ ব্যক্তিরও এই দেহের প্রয়োজন লোককল্যাণের জন্য।

সুতরাং দেহকে উপেক্ষা করা চলে না। আর দেহকে যদি উপেক্ষা করা না যায়, তবে এর ভিতরেই তো সংসার আছে। সুতরাং পূর্ণত্যাগ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীকেও দেহরক্ষার জন্য ভিক্ষা করতে হয়, বাসযোগ্য একটি আশ্রয় খুঁজতে হয়।

অনেকেই সংসারে একটু বিরক্তবোধ করলে বা ঈশ্বরে একটু আকর্ষণ হ'লেই মনে করে সংসার ছেড়ে যাই। কিন্তু কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে, সেখানেই সংসার। স্বামীজী তাঁর কবিতায় বলেছেন:

যতদূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।

সুতরাং বাহ্যসংসার-ত্যাগই পথ নয়, সংসারের প্রতি আসক্তি-ত্যাগই পথ। তাই বলছেন, সংসারে থাকলেও নিকৃতির কাঁটার মতো ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রাখতে হবে। ঈশ্বরের দিকে সমস্ত মন থাকলে তবেই আর মনে আসক্তি স্থান পায় না। ঠাকুর একটি প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ ক'রে বলছেন. ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে কেন? কারণ গর্ভাবস্থায় সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সে সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল। "গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।" তাই ঠাকুর বলছেন, বাহ্য দিক থেকে সংসার ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই গৃহস্থের পক্ষে, প্রয়োজন মনের আসক্তি ত্যাগ করার।

সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেও এই মনের ত্যাগই প্রধান কথা, তবু তাঁর পক্ষে বাইরের ত্যাগেরও প্রয়োজন আছে, কারণ তাঁকে ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করতে হবে, নিজের জীবনে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। এই জন্যই উভয় অধিকারীর ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে উপদেশের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে যে সন্ন্যাসী, সে কি সংসারের বাইরে? তার কি সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না? যদি থাকে, তবে সে কি করবে? নিশ্চয়ই তাকে নির্লিপ্ত হ'তে হবে। সংসারের সকল বস্তুকে, সব কিছুকেই নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এইটি মনে রাখতে হবে সকলকেই—গৃহী, সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই এই উপদেশ একান্তভাবে সত্য। যতক্ষণ দেহাভিমান আছে, বাইরের ত্যাগ থাকলেও সন্ন্যাসীও মুক্ত নয়। ত্যাগী হ'ক, গৃহী হ'ক, এই অভিমান দূর করবার জন্য তার সাধন করতে হবে।

রাম-বশিষ্ঠ-আলোচনা

লেখাপড়া শিখে জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে সংসারের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি এই পর্যন্ত। কিন্তু মনে মনে যখন এই ধারণাটি দৃঢ় হ'য়ে যাবে যে, এই সংসার অসার তুচ্ছ, একমাত্র তখনই আর সংসার আমাদের আকর্ষণ ক'রতে পারবে না, কিন্তু সংসার থেকেই যায়, তাকে ত্যাগ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়—এই কথাটি ঠাকুর আবার জোর দিয়ে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র ও বশিষ্ঠের গল্পটি ব'লে। শ্রীরামচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য হয়েছে। দশরথ বশিষ্ঠ মুনিকে পাঠালেন রামকে বোঝাবার জন্য, যাতে তিনি সংসার ত্যাগ না করেন। তাঁদের কথোপকথন বিস্তৃতভাবে রয়েছে 'যোগবাশিষ্ঠ' নামক গ্রন্থে। সেখানে অবশ্য চরম অদ্বৈতবাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জগৎ-সংসার সব মিথ্যা, 'শশবিষাণবৎ'—খরগোশের শিঙের মতো—আকাশ-কুসুমের

মতো মিথ্যা। সুতরাং যে বস্তু মিথ্যা, তাকে আর ত্যাগ ক'রব কি ক'রে? সত্য বস্তুরই ত্যাগ সম্ভব, মিথ্যার নয়। তবে বর্তমান উপাখ্যানে ঠাকুর এই যুক্তির অবতারণা না ক'রে বশিষ্ঠের অন্য একটি যুক্তির উল্লেখ করছেন। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন রামকে, 'সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতেই সমস্ত সত্য ব'লে বোধ হচ্ছে। তখন তিনি চুপ করে রইলেন। এই যে ঈশ্বরই সব হয়েছেন, জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—সব কিছু, এটি ঠাকুরের একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত, যা তিনি বারবার বলেছেন। 'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'—তিনি ছাড়া এই জগতে স্থাবর-জঙ্গম আর কোন বস্তু নেই।

সর্বত্র যদি তিনিই থাকেন, তখন আর সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন কি? সংসার ত্যাগের প্রশ্ন ততক্ষণই, যতক্ষণ সংসার মনকে ঈশ্বরবিমুখ করে। কিন্তু যদি সর্বত্র সেই ঈশ্বরকে ওতপ্রোতভাবে দেখা যায়, তা হ'লে আর সংসার ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে কই? এইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে সংসার ত্যাগের কথা বললেও সকলের জন্য তিনি কখনো সংসার ত্যাগের উপদেশ দেননি। তিনি বলছেন, এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও যে তিনি সমস্ত সংসারে পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্ম ছাড়া বিচিত্র জগৎ ব'লে আর কিছু নেই। শাস্ত্রও তাই বলছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন'—সুতরাং ত্যাগ ক'রব কাকে, ঈশ্বরকে ত্যাগ করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। যে মনে করে এই জগৎ তার মনকে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত করছে, তার কাছে এই প্রশ্ন আসে এবং সে প্রশ্নের উত্তর সংসার-ত্যাগ নয়, সংসারের প্রতি আসক্তি-ত্যাগ। এইজন্য ঠাকুর বলছেন অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থাকো। কে বলছে যে এই সংসার ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণ? কে বলছে যে এই সংসার মনকে ঈশ্বর থেকে বিমুখ করবে? যদি দেখো যে সর্বত্রই ঈশ্বর, তবে মন কি ক'রে তা থেকে বিমুখ হ'তে

পারে? তাঁকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ব'লে বুঝতে হবে. তা হ'লে আর সংসার-ত্যাগের প্রশ্ন আসবে না। এই কথাই ঠাকুর অন্য এক জায়গায় আর একভাবে বলেছেন, 'চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম, কিন্তু ভাল লাগল না। চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ খুললেই নেই?'

আমরা দেখছি যার পক্ষে যেটি অনুকূল, তাকে ঠাকুর সেই উপদেশ দিয়েছেন। সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ ও গৃহস্থ নিকৃষ্ট—এ কথা কোথাও বলেননি। দুজনেই ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ। সংস্কার অনুসারে এক একজনের এক এক পথে চলা সহজ। স্বামীজীও এ সম্বন্ধে বিস্তার ক'রে বলেছেন, নিজের নিজের আদর্শে যে পৌঁছেছে, সেই শ্রেষ্ঠ। একের আদর্শ দিয়ে অপরকে বিচার করা চলে না। অবশ্য স্বামীজী এ-কথাও বলেছেন যে, ত্যাগীর যে জীবন এক দিক দিয়ে মাত্র তার শ্রেষ্ঠতা আছে। তা হচ্ছে এই যে, সে ত্যাগের আদর্শকে জ্ঞানতঃ স্বীকার করেছে এবং সংসারের গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ ক'রে অন্যপথে, ত্যাগের পথে চলবার চেষ্টা করছে। এইভাবে সে জীবন দিয়ে ত্যাগের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী আবার সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, ত্যাগের এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা ভাল, কিন্তু তা যেন অন্ধ শ্রদ্ধায় পরিণত না হয়। সকলেই যেন সেই পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত না হয়। এই অন্ধ অনুকরণের যে কি কুফল ফলেছিল, তা বৌদ্ধযুগেই দেখা গিয়েছে।

দুই পথ : সংসার ও সন্ন্যাস

সংসারে থেকেও ভগবানের দিকে যাবার পথ প্রশস্ত আছে, এটি মনে রাখতে হবে। শাস্ত্রপাঠে দেখা যায়, ভগবান নিজেই যেন এই দুটি পন্থা আবিষ্কার করেছেন। জগৎসৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা সনক সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার—এই চারজন ঋষিকে সৃষ্টি ক'রে বললেন, 'যাও

তোমরা প্রজা বৃদ্ধি কর'। কিন্তু তাঁরা সম্মত হলেন না, বললেন 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাংনোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ'—অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি দ্বারা আমরা কি ক'রব? তারা জগৎকে ভোগের উপযুক্ত ক'রে তুলবে. কিন্তু আমাদের তাতে প্রয়োজন কি? এই আত্মাই আমাদের লোক, অর্থাৎ ভোগ্য। এ ছাড়া অন্য ভোগ্যবস্তুতে আমাদের প্রয়োজন নেই। এই ভাবে তাঁদের দ্বারা যখন প্রজা-সৃষ্টি হ'ল না, তখন ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের আদেশ দিলেন 'তোমরা প্রজা-বৃদ্ধি কর।' তাঁরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী সৃষ্টিকার্যের সহায়তায় প্রবৃত্ত হলেন। তাই বলছি. সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই যেন দুটি আদর্শ চলছে—একটি সন্ন্যাসীর, আর একটি সংসারীর। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মনে ত্যাগ, আন্তরিক ব্যাকুলতা, ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—এই বিশ্বাস নিয়ে ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করলে. তাঁর উপর নির্ভর ক'রে এগিয়ে চললে, তিনিই সব বাধা দূর ক'রে দেবেন। প্রতিকূলতা, যতই থাক, তাঁর শরণাপন্ন হলেই কেটে যাবে। আমরা নিজে কিছুই করি না, করার চেষ্টাও করি না, আর পরিবেশকে দায়ী করি। যদি একান্তভাবে তাঁকে চাই, তাকেই আশ্রয় করি. সব প্রতিকূলতা দূর হ'য়ে যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা ক'রে শরণাগত হ'তে হবে। তাই আসল কথা হ'ল শরণাগতি।

নির্ভরতা ও শরণাগতি

অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাঁকে ধরে সংসার করা—এও কি সম্ভব? অনেক চেষ্টা ক'রে যদি বা তাঁর দিকে একটু মন গেল, তো এমন সব প্রতিবন্ধক দেখা দিল যে মন আর সেদিকে রাখা গেল না। এই সব অসুবিধার কথা তিনিও জানেন। তাই প্রথমেই বলছেন, "সংসারে কাম ক্রোধ—এই সবের সঙ্গে

যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা।" সংসারে থেকে ভগবানে মন রেখে চলা—এটি যেন কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা। যিনি একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হন, ভগবান তাঁর ভার নেন এবং সংসারকে তাঁর অনুকূল ক'রে দেন। সে অবস্থায় সংসার ভগবানলাভের প্রতিবন্ধক তো হয়ই না, বরং তাঁকে লাভ করতে সাহায্য করে। মন যেখানে ভোগের জন্য ছটফট করছে, সে ক্ষেত্রে সংসারের ভিতরে সেই ভোগপ্রবৃত্তিকে একটু আধটু চরিতার্থ করলে তাতে দোষ হয় না। কিন্তু সংসার ছেড়ে যাবার পর তার মন যদি তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে, তা হ'লে তো সর্বনাশ। তখন সে যাবে কোথায়? তখন তার আর কোন কিছু নেই, যাকে আশ্রয় ক'রে সে রক্ষা পাবে। তাই সংসারে কি ক'রে থাকতে হয়, ঠাকুর সে সম্বন্ধে বলেছেন, "সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাত হ'য়ে।" অর্থাৎ তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কর। তা হ'লে যেখানে অনুকূল অবস্থা সেখানে তিনিই তোমাকে নিয়ে যাবেন। তিনি আরো বলেছেন, "ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়!" সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তা হ'লে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন।" আসলে তুমি কোথায় কিভাবে আছ—এ প্রশ্নটাই অবান্তর। আমাদের প্রয়োজন কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। উপনিষদ বলেছেন, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—সেই ঈশ্বর বস্তু দিয়ে সমগ্র জগৎটাকে ঢেকে ফেল। জগৎটাকে জগৎরূপে না দেখে ঈশ্বররূপে দেখতে শেখ। তা হ'লে আর কোথাও অমঙ্গল, অপবিত্রতা দেখতে পাবে না। যেমন ঠাকুর এক জায়গায় যেতে যেতে দেখছেন মাতালেরা

মদ খেয়ে মাতলামি করছে। 'বাঃ বাঃ বেশ হচ্ছে', ব'লে তিনি আনন্দে বিভোর হ'য়ে সমাধিস্থ হ'য়ে গেলেন। মাতালের আনন্দ তাঁকে ব্রহ্মানন্দ স্মরণ করিয়ে দিল, কারণ তিনি সর্বত্রই ব্রহ্মস্বরূপকে দেখছেন। বাইবেল-এও আছে, Thou seest evil because thine eyes are evil.' জগতের যত অশুভকে ঝেঁটিয়ে দূর করা যায় না। সেটা হবে সেই এক রাজার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তার ধুলো সাফ করার মতো ব্যবস্থা। রাজারও যেমন জুতো পায়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত সমস্যার সমাধান হ'ল, এখানেও তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্‌টে নিলেই সংসারে থাকা না থাকার সমস্যার সমাধান হবে। সবই যদি দেখা দেখা যায় যে ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তবে পবিত্র অপবিত্র, ভাল মন্দের কোন দ্বন্দ্বই থাকে না। সেইজন্যই দেখি যে, আমাদের চোখে যে-সব দৃশ্য অপবিত্র বা অশুভ, সেইসব দৃশ্যও ঠাকুরের মনে ঈশ্বরের উদ্দীপনাই জাগিয়ে দিত।

যেখানেই থাকা যাক, ভগবান লাভ করতে হ'লে একদিকে যেমন দরকার এই দৃষ্টিভঙ্গির, অপরদিকে তেমনি দরকার সুদৃঢ় বিশ্বাস—তিনিই সব করছেন। গৃহীই হ'ন আর সন্ন্যাসীই হ'ন—এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে আশ্রয় ক'রে সকলকে সাধনের পথে এগোতে হবে ; এবং সেই সাধন হ'ল বিজয়ের অভিমুখী মনকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করা ও মন থেকে বিষয়াসক্তি যেন দূর হ'য়ে যায়—এই প্রার্থনা করা। কারণ জোর করে বিষয়ভোগ থেকে বিরত থাকলেই বিষয়ের থেকে মন নিবৃত্ত হ'য়ে যায় না। গীতায় তাই বলেছেন :

> বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
> রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ (২।৫৯)

জন্মজন্মান্তরের যে সংস্কার দৃঢ়মূল হ'য়ে রয়েছে, তা এই সংসারের বাইরে গেলেই যে নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে, এ কখনো সম্ভব নয়। এটি অভ্যাস-

সাপেক্ষ। তবে কারো পক্ষে বিষয়ের মধ্যে থেকে অভ্যাস করা প্রয়োজন, কারো বা বিষয় থেকে দূরে স'রে। এক একজনের পক্ষে এক একটি পরিবেশ অনুকূল।

তন্ত্রের দিব্য, বীর ও পশু ভাব

তন্ত্রশাস্ত্রে তাই সাধকদের ভাবকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব। যার ভিতর বিষয়াসক্তি প্রবল তার পশুভাব। পশু মানে জীব অর্থাৎ জীবভাব বা জৈব প্রবৃত্তি যার মনে অত্যন্ত প্রবল; তার জন্য এই বিধান যে সে বিষয় বা ভোগের বস্তু থেকে দূরে থাকবে, ভোগের বস্তুকে পরিহার ক'রে চলবে, যাতে বিষয় তার মনকে ভোগের দিকে টেনে না নিয়ে যায়। এরপর বীরভাব অর্থাৎ যার মনের উপর খানিকটা প্রভুত্ব আছে, তার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে বিষয়ের মধ্যে থেকেও মন যাতে বিষয়ের দিকে না যায়, সেই চেষ্টা করা। এই লড়াই করার চেষ্টাই তার পরীক্ষা। এরপর দিব্যভাব,—যার মন থেকে অশুভ সংস্কার মুছে গিয়েছে, সে দিব্য-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েছে। তার পক্ষে ভোগের বস্তু কাছে থাক বা না থাক, তাতে তার কিছু ইষ্টাপত্তি নেই, কারণ তার মন এমন একটা সুরে বাঁধা হ'য়ে গিয়েছে যে ভোগ্য-বস্তুর দিকে তার মন আর যায় না। সে যেখানেই থাকুক তার পক্ষে সবই সমান। এখন এই তিনটির মধ্যে একজনের পক্ষে যা অনুকূল, অপরের পক্ষে তা অনুকূল তো নয়ই, বরং পরিহার্য। এইটি না বোঝার ফলে পশুভাবাপন্ন সাধক বীরভাবের অনুকরণ করতে গিয়ে কেবল নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে না, সমাজেরও অকল্যাণ করে। আবার বীরভাবের সাধক যে সর্বদা ভোগ্য বস্তু পরিবৃত হ'য়ে থাকবে তা নয়। তাকে যা করতে হবে তা হ'ল বিষয়ের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকার চেষ্টা, কারণ সংসার থেকে পালিয়ে যাবার তো কোন জায়গাই নেই।

আসক্তি-নাশ

এখন আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, যতক্ষণ নিজেকে একটি ব্যক্তিরূপে, জীবরূপে কল্পনা করছি, ততক্ষণ এই সংসারের গণ্ডী আমার ছাড়াবার উপায় নেই। সুতরাং মনকে তৈরী করতে হবে, মনের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিতে হবে, উপনিষদের ভাষায় হ'তে হবে 'আবৃত্তচক্ষু'। ঠাকুরেরও সেই কথা, বিষয়ের দিক থেকে মনকে আত্মাভিমুখী কর, তার মোড় ফিরিয়ে দাও, তবেই নিষ্কৃতি। সংসার ত্যাগ করলেই আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাব, মন অন্তর্মুখ হ'য়ে যাবে—এ ধারণা ভুল। আমাদের মন তখনই অন্তর্মুখ হবে, যখন বিষয়াসক্তি দূর হবে। বিষয়াসক্তি যদি থাকে তবে তা সংসারের মধ্যে শত্রুতা করবেই, সংসারের বাইরেও তার শত্রুতা হবে আরো প্রবল। এই জন্যই ঠাকুর বারবার সাবধান করছেন, 'সংসারে থাকলে হবে না কেন? আর সংসার ছেড়ে যাবে কোথায়?' বলছেন, 'একজন কেরানী জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হ'লে, জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচবে? না, কেরানীগিরিই করবে?' সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার এখান-সেখান নেই, তার সব সমান। সর্বত্র যিনি ব্রহ্মদর্শন করছেন, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর কোন হানি হয় না। পূর্বসংস্কারবশত চালিত হ'লেও কোন বিষয় বা কর্ম তাঁকে আর আবদ্ধ করতে পারে না, কারণ সেই পরমতত্ত্বকে জেনে তাঁর সর্বতোভাবে বিষয়রসের নিবৃত্তি ঘটেছে, 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।' ঠাকুর এখানেও একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন—"যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন

অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে প'ড়ে থাকে। অবিদ্যা ল্যাজ খসলে—জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারেও থাকতে পারে।' "কিন্তু যতক্ষণ না সেই পরমতত্ত্বকে জানছ, ততক্ষণ সংগ্রাম ক'রে যেতেই হবে, তা যেখানেই থাক। সেজন্যই ঠাকুর বলেছেন—তোমরা কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করছ, এতে দোষ নেই। কেননা লড়াই করতে করতে যদি দু-চারবার হার হয় তাতে দোষ নেই, আবার উঠে পড়ে লাগবে। কিন্তু সংসার ত্যাগ ক'রে তারপর যদি হেরে যাও, তা হ'লে তো সর্বনাশ! কেননা এমন একটা আদর্শকে তুমি ধরবার চেষ্টা করেছ যে আদর্শের ভিতর কোন আপস সম্ভব নয়। সেই আদর্শকে অধঃপাতিত করলে তোমার অমঙ্গল, সমাজেরও অমঙ্গল। সুতরাং খুব সাবধান হ'য়ে এদিকে পা বাড়াতে হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন্‌টি আমার পথ? তার উত্তর শাস্ত্র দিয়েছেন এবং যাঁরা সাধু, যাঁরা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, তাঁরা বলেছেন যে যদি দেখ, তোমার মধ্যে প্রবল বৈরাগ্য আছে—'প্রবল' বা 'তীব্র' বিশেষণটি বিশেষভাবে মনে রাখার মতো—তুমি সংসার ত্যাগ ক'রে যেতে পারো। কিন্তু যদি তোমার ভিতর বৈরাগ্যের তীব্রতা না থাকে, তুমি যদি দোটানায় থাকো, তা হ'লে তোমার পক্ষে যেখানে আছ, সেখানে থাকাই ভাল; সেখান থেকেই তোমার সাধন করা উচিত। যদি অনধিকারী সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রহণ করে, তা হ'লে তার পক্ষে সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়, এবং আদর্শ যে পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হবে, সেই পরিমাণে সমষ্টিগতভাবে তা হবে মলিন, যা জগতের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। এইজন্য বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী হয়েও স্বামীজী বলেছেন, নির্বিচারে সন্ন্যাসধর্ম প্রচার ক'রে বুদ্ধ সমাজের একটি মহা অকল্যাণ করেছেন।

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম

মূলকথা এই যে, যিনি যে আদর্শই বেছে নিন না কেন, সকলেই ভগবানকে পাবার পথেই চলেছেন। বহুসময় দেখা যায় যে গৃহস্থের ভিতর এমন অনেকে আছেন, যাঁরা খুব ত্যাগী; ত্যাগের জীবন অবলম্বন করেছেন, এমনও কেউ কেউ আছেন, যাঁরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সে পথে চলতে পারছেন না। তাই স্বভাবতই একটা প্রশ্ন ওঠে, তা হ'লে সন্ন্যাসীকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় কেন? তার কারণ সন্ন্যাসী একটা খুব বড় আদর্শ জীবনে বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে সংসারী সাধারণভাবে গতানুগতিক প্রবাহে চলেছেন। সে স্বেচ্ছায় কোন একটি বিশেষ পথ নির্বাচন ক'রে নেয়নি—যেখানে জন্মেছে,সেখানেই বড় হয়েছে, সেখানেই রয়েছে। এটা হ'ল সাধারণভাবে দেখা। কিন্তু সংসারী যদি সংসারটিকে আশ্রম ব'লে ভাবেন ও নিজেকে আশ্রমী ব'লে জানেন, তা হ'লেই এই গতানুগতিকতা ঘুচে যায়। আমাদের শাস্ত্রও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে অনাশ্রমী অর্থাৎ কোন আশ্রম অবলম্বন করেনি, তার জীবন ব্যর্থ। এর যে কোন একটি বা একাধিক আশ্রম তো সকলকেই অবলম্বন করতে হয়, সুতরাং ব্যর্থতার প্রশ্ন ওঠে কোথায়, এর উত্তর এই যে, গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হ'য়ে আশ্রমের নির্দিষ্ট সমস্ত কর্তব্য সার্থকভাবে সম্পাদন ক'রে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টাই হচ্ছে ঠিক ঠিক আশ্রমীর জীবন। এর মধ্যে ব্রহ্মচর্য হ'ল সকল আশ্রমের জন্য প্রস্তুতি। সেখানে সে নিজেকে তৈরী করবে পরবর্তী আশ্রমের কোন একটিকে অবলম্বন করার জন্য। ইচ্ছা করলে সে পরপর তিনটি আশ্রমই অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু তার পূর্বেই কোন সময় যদি তার মনে সেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে সমস্ত কর্তব্য ফেলে সে তৎক্ষণাৎ ভগবানের জন্য বেরিয়ে যেতে পারে; যে কথা শাস্ত্রে বলেছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ

তদহরেব প্রব্রজেৎ।' কিন্তু এই বৈরাগ্য হওয়া চাই তীব্র। এখানে কোন পলায়নী বৃত্তি (escapism) চলবে না। এমন তীব্র বৈরাগ্য যে সংসারকে তখন মনে হবে পাতকুয়া—যেখানে পড়লেই মৃত্যু।

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে মন দিয়ে মনের অপব্যয় ক'রব না—এই রকম মনোভাব যখন তীব্র হ'য়ে ওঠে, তখনই হয় বৈরাগ্য সহজ ও অনুকূল। কিন্তু বৈরাগ্য যতক্ষণ না এত তীব্ররূপ ধারণ করে, ততক্ষণ সংসারাশ্রমের সহায়তা দরকার। সংসারকে ধর্মের সংসারে পরিণত করতে পারলে তা হয় সাধনেরই অনুকূল। এইজন্যই ঠাকুর দুটি আদর্শকেই প্রচার করেছেন। উদ্দেশ্য এক—ভগবানলাভ, কিন্তু অধিকারীভেদে পথ দুটি। যদি সংসারে থেকে একজন নাগমশাইএর মতো সংসারী হ'তে পারেন, তবে সেই সংসারে থাকাটা তাঁর দোষের কোথায়? আর সংসার ত্যাগ ক'রে যদি কেউ স্বামীজীর মতো বা যথার্থ কোন ত্যাগী সাধুর মতো হন, তবে সংসারে তাঁর প্রয়োজন কি? তাই যার পক্ষে যেটি অনুকূল তাকে তিনি সেই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু কোথাও আপস করেছেন বা সংসারীদের স্তোকবাক্য দিয়েছেন, এ কথা মনে করা ভুল।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের বৈচিত্র্য

ভাবগ্রাহী ঠাকুর কারো ভাব নষ্ট করার বিরোধী ছিলেন বলে যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের উপদেশ দিয়েছেন—তখন তা অতি সাবধানতার সঙ্গেই দিয়েছেন যেন অন্য কেউ না শোনে। এ সাবধানতা কি তাঁর পক্ষপাত? তা নয়। তিনি জানেন যে এরা সংসারের আশ্রয় না নিয়েও এগিয়ে যেতে পারবে, তাই যদি তাঁদের মনের ভিতর সংসার সম্বন্ধে সামান্য দুর্বলতাও থাকে, সেটি দূর করার জন্য একদিকে তাদের সামনে সংসারের একটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বীভৎস চিত্র তুলে ধরছেন, অপরদিকে

ত্যাগময় জীবনের জন্য জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু গৃহস্থ জীবন যার সাধনের পক্ষে অনুকূল, এই তীব্র ত্যাগের আদর্শ শুনলে তার মনে সংশয় আসবে, তাই ঠাকুরের এই সাবধানতা। মনে রাখতে হবে, নিজের 'আশ্রমে' যদি শ্রদ্ধা না থাকে, সে কখনো এগোতে পারে না। তাই সংসারীকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এ সংসারটা একটা তুচ্ছ জিনিস নয়, এটি ভগবানের দিকে যাবার একটি উপায়। সংসারী জীব বলে নিজেদের তুচ্ছ ভাবার একটা স্বভাব অনেকের আছে, সেটা ঠিক নয়। ঠাকুরের আদর্শ তা নয়। 'সংসরতি ইতি সংসারঃ'—জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেই যাচ্ছে সেই সংসারী—এই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে সংসারী নয় কে? ঠাকুর তাই সকলকে বলছেন, এগিয়ে পড, যে যেখানে আছ ভগবানকে লাভ করবার জন্য এগিয়ে চল।

ত্যাগী ও গৃহীর ক্ষেত্রে যেমন তাঁর উপদেশের একটি আপাত বিরোধ দেখা যায়—অথচ দুটিই সত্য, সেই রকম আর একটি ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি স্ববিরোধী ব'লে মনে হয়। সেটি হ'ল এই যে, ঠাকুর যখন পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন তখন এক এক জায়গায় এক এক রকম বলেছেন। কোথাও বলেছেন, তিনি এক, অদ্বিতীয়, বাক্য মনের অগোচর। কখনো বলছেন, তিনি কি রকম ?—যেন মোমের ফুল, মোমের ফল, মোমের বাগান। কখনো বলছেন, 'নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ'। কখনো বলছেন, 'আমিই তিনি।' প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রেও এমনি বহু আপাত বিরোধী উক্তি আমরা দেখি। কিন্তু যদি পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে—এর মধ্যে সত্যি কোন বিরোধ নেই। এই বিভিন্ন যে উপদেশ সবই সত্য কারণ তাঁর পথে যেতে হ'লে এই বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতির মধ্য দিয়ে সাধকদের যেতে হয়। ঠাকুর স্বয়ং সর্বপ্রকার সাধন অবলম্বন করেছেন। যে ভাবগুলিকে আমাদের পরস্পর-বিরোধী মনে হয়, নিজের

জীবনে তিনি তার সবকটিই উপলব্ধি করেছেন বলেই যার পক্ষে যে ভাবটি গ্রহণ করা সহজ বলে বুঝেছেন, তাকে সেই উপদেশ দিয়েছেন। ঠাকুর একাধারে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনি জানেন এর প্রত্যেকটিই সত্য এবং প্রত্যেকটিই কারো না কারো পক্ষে উপযোগী। In my Father's house there are many mansions (St. John 14/2.) এর সব-কটি ভাব দিয়েই তিনি গেছেন ও যার পক্ষে যে ভাব সহজ, তাকে সেই ভাবের নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাই বিভিন্ন উপদেশ দিতে হয়েছে এবং এই সমস্ত উপদেশেরই সংকলন হ'ল 'কথামৃত'। তাই আমাদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে. তাঁর উপদেশ স্ব-বিরোধী হয়ে পড়েছে। এমনকি, যেগুলি সমাজের পক্ষে ঘৃণা সে-রকম পথের উল্লেখও ঠাকুর করেছেন। বলেছেন—এ-ও ভগবানকে লাভ করার পথ। শুধু বলা নয়, নিজে আংশিকভাবে অনুশীলনও করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদেব সাবধান ক'রে বলেছেন. ও বড নোংরা পথ। বেশী লোক যদি ঐ পথ অবলম্বন করে, তবে সমাজের ক্ষতি। তাই পথের নিন্দা করেছেন সত্য, কিন্তু সেই পথ অনুসরণ ক'রে যাঁরা ভগবানের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের তিনি সম্মানও দেখিয়েছেন। এইভাবে নানা বিরোধী সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান পালন ক'রে ও বহু পরস্পর-বিরোধী মতবাদ আশ্রয় ক'রে ঠাকুর শেষ পর্যন্ত সবারই সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আর সেজন্যই তাঁর উপদেশে এত বৈচিত্র্য।

তিন

কথামৃত—১।১।৩৫

দয়ানন্দ ও কেশবের অভিমত

পূর্ব পরিচ্ছেদে ঠাকুর কেশবের উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন—"এরই ল্যাজ খসেছে"—অর্থাৎ অবিদ্যা দূর হ'য়ে জ্ঞান লাভ হয়েছে। এইবার তিনি আরো দুটি সংসারী ভক্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাপ্তেন বা বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কথা বলছেন। তার আগে, গোড়ার দিকে মাস্টার-মশাই ঠাকুরের সম্বন্ধে দয়ানন্দ সরস্বতী ও কেশব সেনের মন্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। যা বলেছেন যে, ঠাকুর পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনে অবাক্ হয়েছেন। স্বামী দয়ানন্দ ঠাকুরকে দেখে বলেছিলেন যে, "পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা খান।" দয়ানন্দ ছিলেন বেদপন্থী, বেদবেদান্তে সুপণ্ডিত, কিন্তু বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধী। ইনি ঠাকুরের অবস্থা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন ও বলেছিলেন যে, আমরা শাস্ত্রে যা পড়েছি, দেখছি ইনি সেগুলি সব অনুভব ক'রে বসে আছেন। কেশব সেন ছিলেন একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই পণ্ডিত, তার উপর ছিল তাঁর বাইবেলের প্রতি গভীর অনুরাগ। যীশুখৃষ্টের চরিত্রের দ্বারা তিনি ছিলেন বিশেষভাবে প্রভাবিত। তিনি বলছেন, এঁর কথা ঠিক যীশুখৃষ্টের কথার মতো—তাঁরই মতো সাদা কথায় ঠাকুর সকলকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিবেশন করছেন। যীশু যেমন ঈশ্বরভাবে তন্ময়, সর্বত্যাগী,

ঠাকুরও সেইরকম। যীশুর যেমন ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, ঠাকুরেরও তেমনি ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস। যীশুর সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞ ইহুদীরা বলতেন—'তিনি যেভাবে কথা বলেন, তা যেন অধিকারী পুরুষের মতো—কথার অনেক জোর'। ঠাকুরের কথা সম্বন্ধেও সেই জোরের কথাই বলেছেন কেশব সেন—"এই নিরক্ষর লোকের এত উদারভাব কেমন ক'রে হ'ল।" কারো সঙ্গে ঝগড়া নেই, কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই, সব ধর্মাবলম্বীদেরই প্রতি তাঁর সমান আদর।

ঠাকুরের কাছে সে-যুগের এই-সব বিশিষ্ট ধর্মনেতা বা জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতেরা আসতেন, বা ঠাকুর তাঁদের কাছে যেতেন। মনে হয়, এর মধ্যে যেন এক নিগূঢ় রহস্য আছে। জগন্মাতার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে তিনি যেন এই-সব ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশেছেন, একদিকে তাদের এক নূতন ভাবে প্রভাবিত করবার জন্য, অপরদিকে এই জগতে কত যে বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

মহর্ষি সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন যে তাঁর ভিতর যোগ ও ভোগ দুইই আছে। ঠাকুরের কথায় বোঝা যায় যে, বড় আধার হওয়া সত্ত্বেও ভোগের মধ্যে থাকার জন্য মহর্ষির পক্ষে ভগবানের দিকে বেশী এগোনো সম্ভব হয়নি। তবে ভোগের ভিতর থাকলেও ভগবানকে তিনি বিস্মৃত হন নি। দেবেন্দ্রনাথ যদিও প্রথম দৃষ্টিতে ঠাকুরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে সমাদর করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক আচার-নিয়মের প্রতি তাঁর আনুগত্য এতই বেশী ছিল যে, ঠাকুরকে দেখে যদি সমাজের লোক 'অসভ্য' বলে হাসে, তাই ঠাকুরকে 'সমাজে' যেতে বারণ করেছিলেন। অর্থাৎ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও হিন্দু আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি হিন্দুধর্মকে সংস্কৃত ক'রে মার্জিতরুচিসম্পন্নদের উপযোগী একটি নূতন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা ভাবতেন।

কেশবের পরিবর্তন

দেবেন্দ্রনাথের ভাবনা যদিও কেশবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, কিন্তু এখানে একটি বিষয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য যে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর কেশব এবং কেশব পরিচালিত ব্রাহ্মধর্মের ভিতর একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল। কেশবের ভক্তি ভাব-তন্ময়তা বিদ্যাবত্তা বাগ্মিতা এগুলি পাশ্চাত্যদেশে তাঁর খ্যাতি অর্জনের সহায়ক হয়েছিল; বিদেশীরা বিশেষতঃ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলর লক্ষ্য করলেন যে, যে কেশব একজন প্রবল ধর্মসংস্কারকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, যত দিন যাচ্ছে তাঁর জীবন যেন সে ভাব থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের আদর্শে যে ভক্তিরসের প্রভাব রয়েছে, কেশব সে-দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁর এই হরিনাম-সঙ্কীর্তন, 'মা, মা' করে প্রার্থনা, এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবকেই মূল কারণ বলে বুঝলেন ও সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানবার তাঁর ঔৎসুক্য হ'ল। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর সেই ঔৎসুক্য আরো প্রবল হয়, কারণ স্বামীজী যাঁর শিষ্য তিনি না জানি আরো কত বিশাল ও মহান্! লুপ্তপ্রায় বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীজীও ম্যাক্সমূলরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ইচ্ছামতো স্বামীজী ভারতবর্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করে তাঁকে দেন, যার উপর ভিত্তি ক'রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেন, যা বিদেশে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়। এইভাবে ঠাকুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, তাঁর বিশেষ বিশেষ ভাবধারার ধারক ও বাহকদের মধ্যে তাঁর উদার ভাব সঞ্চার করতেন, তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার দ্বারা তাঁদের প্রভাবিত ক'রে

পরিচালিত করতেন এমন এক আদর্শের দিকে, যে আদর্শ ধীরে ধীরে তাদের উন্নত করতে সাহায্য ক'রত।

ঠাকুরের নিরভিমানতা

কেবলমাত্র কেশব সেন নয়, অন্য ব্রাহ্মভক্তেরাও ধীরে ধীরে ঠাকুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকেরাও ঠাকুরের কাছে এসে নিজের নিজের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করেন। এইভাবে অপরদের প্রভাবিত ক'রে জগতে সর্বত্র যাতে একটা নূতন ভাবধারা প্রবাহিত হয়, যেন সেই উদ্দেশ্যেই জগন্মাতা তাঁকে যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে যন্ত্র ও যন্ত্রী ভিন্ন নয়—আমরা জানি। তবু তাঁকে যন্ত্র বলছি এইজন্য যে. তিনি যে জগতের একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিচ্ছেন—এ সম্বন্ধে তিনি নিজে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। নিজের বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। তাঁর 'আমি' সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, সেখানে বিরাজ করছিল জগন্মাতার কর্তৃত্ব-অনুভব; আর তাঁর এই বৈশিষ্টাই ছিল এই প্রবল আলোড়ন-সৃষ্টির বা নূতন যুগ প্রবর্তনের মূল-কথা। তাঁর ভিতর অহংকার আছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মাস্টারমশাই যখন বললেন. 'আজ্ঞে আপনার ভিতর অহংকার প্রায় নেই। একটু শুধু আপনি রেখে দিয়েছেন লোকশিক্ষার জন্য।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংশোধন করে বলছেন. 'না, আমি রাখিনি, তিনি রেখেছেন, জগন্মাতা এইটুকু রেখেছেন তাঁর কাজ করাবেন ব'লে।' তাই লীলা-প্রসঙ্গকার বলছেন, ঠাকুরের প্রত্যেকটি কাজ জগতের কল্যাণের জন্য হয়েছে। তাঁর জীবন তাঁর নিজের কোন প্রয়োজনে নয়, জগতের প্রয়োজনে লেগেছে। তাঁর ছোট বড় প্রত্যেকটি কাজই জগৎকল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়

দেবেন্দ্র-প্রসঙ্গের পর ঠাকুর কাপ্তেনের উল্লেখ ক'রে বলছেন, 'আর একটি আছে—কাপ্তেন।' এই কাপ্তেন বা বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নেপালের রাজপ্রতিনিধি হ'য়ে কলকাতায় থাকতেন। ইনিও একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক, মহৎ চরিত্র। প্রাচীনপন্থী সংসারী, কিন্তু অতিশয় ভক্তিমান্ সদাচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ঠাকুরের আচারনিষ্ঠা অতি গভীর না হলেও তাঁর প্রতি কাপ্তেনের আন্তরিক ভক্তি ছিল। আবার কাপ্তেনকে এত ভালবাসলেও তাঁর চারিত্রিক অসম্পূর্ণতা ঠাকুরের দৃষ্টি এড়ায়নি। ভক্তিমান্ হলেও কাপ্তেন আচার-নিষ্ঠাকে এত প্রাধান্য দিতেন যে, ভগবদ্‌ভক্তি যে আচারনিষ্ঠার অনেক ঊর্ধ্বে, তা বুঝতেন না। তাই তাঁর মতে কেশব সেন 'ভ্রষ্টাচারী'—ইংরেজের সঙ্গে খান, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য ঠাকুর যে কেশবের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করেন, এটি তাঁর পছন্দ নয়। তাই যখন তিনি এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে অনুযোগ করলেন, ঠাকুর তাঁর এই অনুদার ভাবকে দূর করার জন্য একটু আঘাত দিয়েই উত্তর দিলেন, "আমি তো টাকার জন্য যাই না—আমি হরিনাম শুনতে যাই, আর তুমি লাটসাহেবের বাড়ীতে যাও কেমন ক'রে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে?" কাপ্তেনের কোন পরিবর্তন এতে হয়েছিল কিনা আমরা জানি না, তবে তিনি নিরুত্তর হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ও অসাধারণত্ব

এই যে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রসঙ্গ হ'ল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—ঠাকুর সেই সেই ব্যক্তির সদ্‌গুণের প্রশংসা করছেন, আবার যেখানে

তার অপূর্ণতা সেটিও লক্ষ্য করেছেন ও সম্ভব হ'লে সেটি দূর করার প্রয়াসও করেছেন। দয়ানন্দকে দেখে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে ঠাকুর বুঝেছিলেন যে, তাঁর ভিতর একটা শক্তির প্রকাশ হয়েছে এবং তিনি একটি নূতন দল বা সম্প্রদায় গঠনে অভিলাষী। ঠাকুর দয়ানন্দের কাছে নিজেই উপযাচক হয়ে গিয়েছিলেন ও তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা প্রভৃতির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর গোঁড়ামি বা নূতন দল গড়ার চেষ্টা ঠাকুরের মনঃপূত হয়নি। তাঁর মতে দল-বাঁধা (মনের সংকীর্ণতার প্রকাশ), অপূর্ণতার পরিচায়ক। মন যেখানে সকলকে গ্রহণ করতে সকলের ভিতর যে সদ্ভাব আছে সেগুলির সমাদর করতে পারে না, তখনই সে দল করে। মহর্ষি সম্বন্ধে বলেছেন, এত পণ্ডিত জ্ঞানী ভক্ত, অথচ সংসারী। অর্থাৎ সংসারে আসক্তি রয়েছে। আর কেশব সেনকে তো হাতে ধ'রে একটু একটু ক'রে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, 'বল, ভাগবত ভক্ত-ভগবান্।' কেশব তাই বলছেন। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন, 'বল গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব', কেশব হাতজোড় ক'রে তখন বললেন, 'মহাশয়, অতদূর নয়—তা হ'লে দলটল থাকবে না।' অর্থাৎ তখনো কেশবের দল রাখার ইচ্ছা রয়েছে। ঠাকুর শুনে হাসছেন, হাসছেন এইজন্য যে ওষুধ পড়েছে, রোগের উপশম শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে। এখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। তাই অপেক্ষা করছেন, কেশবকে আরো উৎসাহিত করছেন নিজের ভাবে এগিয়ে যাবার জন্য।

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে উপাধ্যায়কে বলছেন, এসব তো অনেক করলে, এখন এসব ছেড়ে একটু ভগবানে মন দাও দেখি। লোকে না হয় বলবে পাগল হয়েছে—তা হও পাগল। এইভাবে যিনি বিপথ-গামী হচ্ছেন তাঁকে কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন ঠাকুর। তাঁর লোকোত্তর জীবনাদর্শ দিয়ে,

স্নেহ দিয়ে, অপরিসীম উদারতা দিয়ে তাঁদের মোহিত ক'রে, তাঁদের নিজের নিজের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। কি সে প্রকৃত পথ? সে-পথ ভগবান্‌কে ভালবাসার পথ, তাঁকে লাভ করবার পথ। কে কোন্ ধর্মাবলম্বী তাতে কিছু এসে যায় না, তিনি শুধু চাইতেন সকলেই ভগবানের পথে এগিয়ে যাক। তাই তিনি সকল ধর্মেরই সমাদর ক'রে বলছেন যে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন পথের যাত্রী হলেও তোমরা সকলেই সেই একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। সুতরাং নিষ্ঠাভরে লক্ষ্য ঠিক রেখে নিজের নিজের পথে এগিয়ে যাও।

এখন এই তত্ত্বটি যে ঠাকুরই প্রথম বললেন, তা নয়, তত্ত্বটি সুপ্রাচীন। বেদে আছে,—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—একই সত্যবস্তুকে ঋষিরা বহুভাবে বর্ণনা করেন। যীশুও বলেছেন গন্তব্য একটিই, কিন্তু প্রবেশ-দ্বার অনেকগুলি। কিন্তু তবুও ঠাকুরের বলার একটি বিশেষ মূল্য আছে। তিনি বলেছেন স্বীয় উপলব্ধি থেকে। তাঁর পূর্বে বা এখনো পর্যন্ত এমন কেউ নেই, যিনি নিজেই বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে পরম-তত্ত্বকে অনুভব করেছেন। প্রচলিত প্রায় সমস্ত ধর্মের সাধন ক'রে নিজের জীবনে সত্যকে অনুভব করার এ দৃষ্টান্ত জগতে অদ্বিতীয় এবং সেই জন্যই চুম্বকের কাছে ছুঁচ এলে যেমন স্বতই আকৃষ্ট হয়, তেমনই এইসব মহান্ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষেরা ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সেই সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর যে প্রভাব পড়েছিল, ক্রমে তা সুদূরপ্রসারী হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে দেশে দিকে দিকে এখন ঠাকুরের ভাবধারা প্রসারিত হচ্ছে, আর এই ভাবধারায় সংকীর্ণতা নেই বলেই তার এত আকর্ষণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন-যোগ্য। যাঁরা অধুনা বাস্তবিকই ধার্মিক তাঁরা সকলেই ঠাকুরের এই উদার আদর্শের মধ্যে নিজেদের আদর্শ প্রতিফলিত দেখছেন। যে কথা তিনি বলেছিলেন, 'যারা অন্তরের সঙ্গে ভগবান্‌কে ডেকেছে, তাদের এখানে

আসতেই হবে'—সেই কথাই আজ সত্য হয়ে উঠেছে। তাই দেখি, যিনি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণকারী, তিনি যে ধর্মাবলম্বী, যে পথেরই পথিক হ'ন, তিনি এই উদার মতে আকৃষ্ট না হ'য়ে পারেন না; এই দুর্বার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না।

চার

কথামৃত—১।১৩।৬

জ্ঞানী চাষার আখ্যান

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই ঠাকুর বেদান্ত-বিচারে সংসার যে মায়াময় স্বপ্নের মতো, এটি আলোচনা করেছেন। যিনি পরমাত্মা, তিনিই সাক্ষীস্বরূপ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তিন অবস্থারই সাক্ষীস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে মহিমাচরণকে ঠাকুর জ্ঞানী চাষার এক গল্প শোনালেন। চাষী—তার একমাত্র ছেলে হারুর মৃত্যুতে শোক করছে না। স্ত্রীকে বলছে, "কাল স্বপ্নে দেখেছি, আমি রাজা হয়েছি, আট ছেলের বাপ হয়েছি। এখন আমার সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না তোমার হারুর জন্য কাঁদব?" অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগ্রতে তার পৃথক বোধ নেই, দুই-ই সমান। এই পার্থক্য বোধ না থাকার কারণ, এ তিনের অতীত একটি অবস্থার অনুভূতি, যাকে 'তুরীয়' অবস্থা বলা হয়। তুরীয় অবস্থায় যে অনুভূতি হয়, সেই দৃষ্টিতে দেখলে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—সবই মিথ্যা মনে হয়; তিনটিই যেন জীবের অজ্ঞানের অবস্থা। সুতরাং এই মিথ্যা কল্পনার যে জগৎ, তার জন্য তার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে না, তার অনুভব মনকে চঞ্চল করে না। তাই ঠাকুর বলছেন, "চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন

অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা ; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।"

অবস্থাত্রয় : জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

আমাদের এই অনুভবটি ধারণা করা খুবই কঠিন, কারণ আমরা জাগ্রৎকে সত্য বলে বুঝতে অভ্যস্ত। এইটিকে ধরে রাখতে চাই। স্বপ্নকে অনুভব করি। স্বপ্ন ভেঙে গেলে দেখি, সব মিথ্যা ; কিন্তু জাগ্রৎকে স্বপ্নের মতো মিথ্যা বলে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। বস্তুতঃ তাই স্বাভাবিক। কারণ স্বপ্ন যেমন বাধিত হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়, সেইরকম আমাদের আর একটি অবস্থা নেই, যা এই জাগ্রৎকে স্বপ্নের মতো মিথ্যা প্রমাণিত করে। সুষুপ্তিতে যদিও জাগ্রৎ এবং স্বপ্নে দেখা জগৎ—এ দুটি অদৃশ্য হ'য়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না। অদৃশ্য হওয়া আর মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া -এ দুটি এক কথা নয়। যেমন, সামনে দেওয়াল থাকলে অপর পারের বস্তু দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দেখতে পাই না বলে সেটা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। দেওয়ালের ব্যবধানের জন্য দেখতে পাই না। সেই রকম সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় নয় ব'লে আমরা সেখানে বস্তুর অনুভব করি না। আমি যদি চোখ বন্ধ করি তা হ'লে কি জগৎ সঙ্গে সঙ্গে লয় হ'য়ে যায়? তা তো হয় না। জগৎ অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হয় না।

মিথ্যা প্রমাণিত করতে হ'লে তাকে তার চেয়ে একটু উঁচু অবস্থা থেকে দেখতে হবে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন বাধিত হয়। যদিও বেদান্তে কোথাও কোথাও স্বপ্নের দ্বারা জাগ্রতের 'বাধা' কল্পনা করা হয়েছে—যেমন গৌড়পাদকারিকার অজাতবাদে। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে সকলেই এমন কি শঙ্কর স্বয়ং-ও এই ব্যবহারিক জগতের সত্তাকে স্বীকার

করেছেন। যে জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব আমরা এই ব্যবহারের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করি, স্বপ্ন তারই একটি নিম্নতর অনুভূতি মাত্র, যাতে উপলব্ধি হয়, কিন্তু জাগ্রতের দৃষ্টিতে দেখলে তার ভিতর পরম্পরা থাকে না। তার ভিতর কালের পরম্পরা, বস্তুর শৃঙ্খলা, কার্যকারণ-সম্বন্ধবোধ এত স্পষ্ট থাকে না। সেজন্য স্বপ্নকে আমরা মিথ্যা বলি। যেমন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি যে, দিল্লী অথবা আরো দূরে গিয়েছি। দেহটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে বলছি, স্বপ্ন দেখছিলাম—দিল্লী গিয়েছি।

এই স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার বা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি আছে। কেউ কেউ বলেন, স্বপ্নকালে আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে দূরে যায়; যেমন দিল্লী গেল, আবার ফিরে এল। কিন্তু অনেক জিনিস আছে, যার ভিতর এরকম কোন পারম্পর্য নেই, যাতে বোঝা যায় যে সেগুলি মিথ্যা। স্বপ্ন যে মিথ্যা, তা বোঝাবার অনেক যুক্তি আছে। আমি এই শরীরের ভিতর আছি, কিন্তু কখনো কখনো মনে হচ্ছে—শরীরটা বদলে গিয়েছে। আবার জেগে উঠে দেখলাম—শরীর তো ঠিক আছে, বদলে তো যায়নি। স্বপ্নের ভিতরে এইরকম নানা বৈসাদৃশ্য বিশৃঙ্খলা আছে, যার জন্য আমরা স্বপ্নকে মিথ্যা বলি। অনেক সময় স্বপ্নে দেখি, যেন কতকাল কেটে গিয়েছে; ঘুম থেকে উঠে দেখলাম হয়তো পাঁচ মিনিটও ঘুম হয়নি। এই যে পাঁচ মিনিটের স্বপ্নে যুগ যুগ কেটে গেল, এইটি স্বপ্নের মিথ্যাত্ব প্রমাণের পক্ষে এক প্রবল যুক্তি—স্থান, কাল, তার পরম্পরা বা কার্যকারণ-শৃঙ্খলা, কিছুই নেই। কাজেই জেগে উঠে বলতে পারি, স্বপ্ন মিথ্যা। স্বপ্নের ভিতর থাকার সময়ে বিচার হয় না। কখনো মনে হয় এটা স্বপ্ন—স্বপ্নের ভিতরেই স্বপ্ন—কিন্তু সেও স্বপ্নের অঙ্গীভূত, তার দ্বারা বিচার হয় না। জেগে উঠে অনুভবের দ্বারা স্বপ্নের বিচার করতে বসি। তার ভিতর শৃঙ্খলা পারম্পর্য নেই দেখে অনুমান করি স্বপ্নের মিথ্যাত্ব। মিথ্যা যদি না হয়, তবে এত অল্প সময়ে দিল্লী ঘুরে

আসা, বা অল্প সময়ে এত দীর্ঘ ঘটনা অনুভব করলাম কি ক'রে? সুতরাং এটি মিথ্যা। এই স্বপ্নের দেশ কাল, ব্যক্তি—সবই মিথ্যা। স্বপ্ন যে মিথ্যা, কল্পনা মাত্র, এটি পদে পদে প্রমাণিত হয়।

স্বপ্নমিথ্যা, কিন্তু জাগ্রৎ-ও যে মিথ্যা—তা স্বপ্নানুভবের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, অন্ততঃ যাঁরা ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকার করেন তাঁরা এ-কথা বলেন। স্বপ্নের অনুভব যখন হচ্ছে, তখন তা স্বপ্ন। জাগ্রতের অনুভব যখন হচ্ছে, তখন তা জাগ্রৎ। এ দুয়ের তুলনা আমরা জাগ্রতে যেমন করতে পারি, স্বপ্নে তা পারি না। স্বপ্নে গিয়ে জাগ্রতের বিচার করতে পারলে হয়তো সন্দেহ থেকে যেত—দুটোর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা? দুটো সমপর্যায়ের আমরা বলি না এই কারণে যে, স্বপ্নে আমরা জাগ্রৎকে বিচার করতে পারি না; যদি সে বিচার সম্ভব হ'ত, তা হলে তাদের তুল্য বলা যেত পরস্পরকে মিথ্যা সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়ে। অজাত-বাদের এই সিদ্ধান্তকে আমাদের দেশে সাধারণতঃ বৈদান্তিকেরা এইভাবে স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখলে স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, জাগ্রৎও তেমনি মিথ্যা। দুটিই যে মিথ্যা, তা প্রমাণিত হয় একটি উচ্চতর স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তার আগে নয়। যেমন জাগ্রতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, স্বপ্ন মিথ্যা প্রমাণিত হয়, ঠিক সেইরকম জাগ্রৎ মিথ্যা—তা প্রমাণিত হবে, তার অতীত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। সে স্থিতিটি জাগ্রতের অতীত বা তদপেক্ষা স্থায়ী হওয়া চাই। এই দৃষ্টিতে দেখে তাঁরা বলেন, একটা উচ্চতর সত্তা বা ভূমিকা আছে, যেখানে অবস্থিত হ'য়ে জাগ্রৎকেও স্বপ্নেরই মতো মিথ্যা ব'লে অনুভব করা যায়। সে ভূমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার অতীত। সুষুপ্তি এমন অবস্থা—যেখানে স্বপ্ন পর্যন্ত হয় না। এই সুষুপ্তি সম্পর্কে নানারকম মত আছে। কেউ বলেন সুষুপ্তি অনুভবগম্য; কেউ বলেন, সুষুপ্তি কল্পনা মাত্র। যেমন আমি দুটোর সময় শুলাম,

উঠে দেখলাম, তিনটে বেজেছে। এই সময়ের মধ্যে আমার কোন অনুভব হয়নি। সুতরাং এটা অনুমান করে বলি সুষুপ্তিতে বস্তুর অনুভব হয় না। কারণ অনুভব হ'লে যা অনুভব হয়েছে, তার স্মৃতি থাকত।

অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন যেমন প্রত্যক্ষ, সুষুপ্তি তেমনই প্রত্যক্ষ। কি ক'রে প্রত্যক্ষ হ'ল? প্রত্যক্ষ যদি না হয়, তা হ'লে কেবল ঘড়ি দেখে সুষুপ্তি বললে কি ক'রে বললাম এই ভাবে যে, সুষুপ্তির স্মৃতি আমার নেই, কিছু অনুভব হচ্ছে না। বেদান্তবাদী বলেন, সুষুপ্তিকালে একঘণ্টা ধ'রে তোমার যে অনুভূতি হচ্ছিল না, সেটা তুমি জানলে কি ক'রে? এর উত্তর দেওয়া কঠিন, যদি অনুভব হ'ত তা হ'লে তার স্মৃতি থাকত, এ কথা বোঝানো গেল। অনুভব হয়নি, তার স্মৃতি নেই ; স্মৃতি নেই বললে শুধু হবে না, অনুভব যে তখন হয়নি, তার প্রমাণ কি? তার উত্তরে বেদান্তবাদী বলেন তুমি যে বলছ, অনুভব হয়নি, তার কারণ তুমি তখন অনুভবের কর্তা ছিলে না।

"যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতম্ শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চ অনুভূতং চাননুভূতং চ সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি।" সুষুপ্তিকালে জীব দ্রষ্টারূপে থাকে ব'লে বলতে পারে সে তখন কিছু অনুভব করেনি। দ্রষ্টা না থাকলে সেই সময়টি তার কাছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত, কিন্তু তা হয় না। সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টা থাকে, কিন্তু তখন তার অন্তঃকরণ কাজ করে না ব'লে সে তার স্মৃতিকে ধ'রে রাখতে পারে না। কারণ সে যদি না থাকত কিছু যে অনুভব হয়নি, এ-কথা কে বলছে?

আত্মা অবস্থাত্রয়ের অতীত

সুষুপ্তি সম্বন্ধে দুটি মত এই। এ সম্পর্কে বেদান্তের সিদ্ধান্ত, সুষুপ্তিকালেও আত্মা থাকে—সে আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এর কোনটিই

নয়—তার সত্তা এ তিনের অতীত। কেননা, এই তিনকে সে অনুভব ও প্রকাশ করছে। এই প্রকাশ বা অনুভব যে করছে, সে এই তিন অবস্থার অতীত, তাই এগুলিকে অনুভব করতে পারে। যদি সে তিন অবস্থার সঙ্গে মিশে যেত, তা হ'লে জাগ্রতের আত্মা স্বপ্নে থাকত না, স্বপ্নের আত্মা সুষুপ্তিতে থাকত না, এইগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। কিন্তু তা যখন নয়, একই আমি যখন জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অনুভব করছি, আবার সেই আমারই সুষুপ্তির বোধ হচ্ছে—তখন সেই আমি এই তিন অবস্থা থেকে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত বেদান্তের বিচারে আসছে। 'অনুবর্তমানেষু যদ্‌ব্যাবৃত্তং তত্তেভ্যো ভিন্নং যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্'– অনুবর্তমান বস্তুসমূহের মধ্যে যা ব্যাবৃত্ত তা অনুবর্তমান বস্তুগুলি থেকে ভিন্ন, যেমন এক সূত্রে গাঁথা ফুলগুলি থেকে সূত্র ভিন্ন।

নানা ফুল দিয়ে গাঁথা একটি মালা, তার মধ্যে যেখানে লাল ফুলটি আছে সেখানে হলদে ফুল নেই; যেখানে হলদে ফুলটি আছে সেখানে সাদা ফুল নেই। এইরকম, বিভিন্ন ফুল পরস্পর থেকে ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকের ভিতর রয়েছে একটি সুতো। এই সুতো যে অনুবর্তমান—সব জায়গায় রয়েছে অথচ ফুলগুলি ভিন্ন ভিন্ন, তা হ'লে বুঝতে হবে সুতোটি ফুলগুলি থেকে ভিন্ন। এই যুক্তি অনুসারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রত্যেকটির মধ্যে আমি আছি। সুতরাং আমি এই তিনটি অবস্থা থেকে ভিন্ন মনে রাখতে হবে, এটি বেদান্তবাদীর প্রবল যুক্তি—আমিই এই তিন অবস্থা অনুভব করছি, জাগ্রৎ ও স্বপ্নে বিবিধ বস্তুর অনুভব করছি এবং সুষুপ্তিতে 'অজ্ঞানে'র অনুভব করছি। অজ্ঞান-অর্থে এখানে বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে না, তাই মাত্র অজ্ঞানের অনুভব হচ্ছে। সুতরাং আমি তিনটি অবস্থা থেকে ভিন্ন, তিনটি অবস্থার সাক্ষী, দ্রষ্টা, প্রকাশক।

এইভাবে বিচার ক'রে যে আত্মাকে আমরা জানলাম, একটা বস্তুর কল্পনা করলাম, যে বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব না হওয়া পর্যন্ত আমরা সে বস্তুকে জেনেছি, একথা বলতে পারি না। অনুমানের দ্বারা বস্তুটিকে যদি বলি 'জেনেছি', সেই জানাকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জানা বলতে পারি না। অনুমান প্রমাণ দ্বারা আত্মাতে একটি অবস্থার কল্পনা করতে পারি, যা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি থেকে ভিন্ন। সেই জ্ঞানকে আমরা 'আনুমানিক জ্ঞান' বলি। তার প্রত্যক্ষ হয় না।

কিন্তু বেদান্তবাদী বলেন, যে আত্মার সম্পর্কে এই অনুমান হচ্ছে, তাকে আমরা জানি কি না। জানি না, এ-কথা বলতে পারি না। কারণ আত্মাকে না জানলে বস্তুকে আমি জানি কি ক'রে? প্রত্যেক বস্তুর অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অনুভব হচ্ছে, অনুভবকর্তারূপে। অনুভবকর্তারূপে আমার অনুভব ছাড়া বস্তুর অনুভব আমি করতে পারি না। সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অনুভবের কর্তারূপে আমি রয়েছি। এই 'আমি'কে যদিও আমরা এইভাবে নিত্য অনুভব করছি, তবুও তিনটি অবস্থা থেকে ভিন্নরূপে কখনো অনুভবের গোচর করতে পারছি না। এজন্য আপাতদৃষ্টিতে এই আত্মা আমাদের অনুমানের বিষয় হচ্ছে, একে আমরা প্রত্যক্ষ করছি না বা বেদান্তদর্শনের ভাষায় পরোক্ষ করতে পারছি না। অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান তাকে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলা হয়। আত্মাকে অনুমান দ্বারা বোঝার চেষ্টা করলাম, তাই পরোক্ষ জ্ঞান হ'ল। অপরোক্ষ জ্ঞান হ'ল না। আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'লে আমাদের এই তিনটি অবস্থা আত্মস্বরূপের তুলনায় মিথ্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। তার পূর্বে আমরা অবস্থা তিনটিকে মিথ্যা বলতে পারছি না। আমরা জাগ্রৎ ভূমিতে অবস্থান ক'রে বলি, স্বপ্ন মিথ্যা। তেমনি শুধু জাগ্রতের অতীত নয়, তিনটি অবস্থার অতীত যে তত্ত্ব, তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যদি কখনো বিচার করতে পারি, তখন এই জাগ্রৎ-ও মিথ্যা বোধ

হয়। সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হ'লে বিচার আর হয় না, কারণ সেখানে দ্বৈত আর থাকে না, বিচার করবে কে?

ঠাকুর এখানে বললেন যে, চাষী বলছেন 'জগৎ স্বপ্নবৎ'। চাষী কোন্ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বলছে? তুরীয় অবস্থা থেকে। ঠাকুর বলছেন, "আমি সবই লই। তুরীয়, আবার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি।" এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা। স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা। সুষুপ্তির কথা বললেন না, কারণ তার সম্পর্কে বিচার করতে গেলে বিচারের ধারা একটু অন্যরকম হ'য়ে যাবে; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা, আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আত্মার তুলনায় অনিত্য। কারণ যখন জাগ্রৎ আছে, তখন স্বপ্ন বা সুষুপ্তি নেই; যখন সুষুপ্তি আছে, তখন জাগ্রৎ বা স্বপ্ন নেই। এই রকম সর্বক্ষেত্রে—যেখানে একটি আছে, সেখানে অপরগুলি নেই। সুতরাং তারা অনিত্য। এক আত্মা হলেন নিত্যবস্তু, কারণ তিন অবস্থার ভিতর আত্মা অনুস্যূত হ'য়ে আছেন। ঠাকুর বলছেন, "আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।"

ব্রহ্ম এই তিন অবস্থার অতীত তত্ত্ব। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সকল বস্তুর আধার রূপ; সকল আরোপের অধিষ্ঠান তিনি। সব বস্তু ব্রহ্মে আরোপিত হচ্ছে। 'মিথ্যা' শব্দটির তাৎপর্য এই যে, মিথ্যা মানে শূন্য নয়। 'মিথ্যা' অর্থাৎ যেভাবে তাকে দেখছি, সেটা সে রকম নয়। যেমন রজ্জু-সর্প, সাপটি মিথ্যা। কেননা, সেটি সাপ নয়, দড়ি। ঠিক সেইরকম এই জগৎটি মিথ্যা; কেননা, আমরা জগৎটি যেমন দেখছি, সেটি তা নয়, আসলে জগৎ ব্রহ্ম। এই দৃষ্টিতে দেখলে আত্মাই সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। ঠাকুর সবই নিচ্ছেন। আত্মার বিভিন্ন অবস্থাকে তিনি অস্বীকার করেননি। তুরীয় তিন অবস্থা থেকে ভিন্ন, একই আত্মা এই তিন অবস্থার অতীত সত্তা, নিত্যবস্তু। 'অবস্থা' বলতে বোঝায় যেটি

সাময়িক ভাবে আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তুরীয়টি সে-রকম চতুর্থ অবস্থা নয়। এ তিনের অতীত একটি তত্ত্ব, যাতে আত্মা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত। আবার মায়া, জীব, জগৎ—আমি সবই লই।" মায়ার প্রভাবে তাঁর জীবজগৎ সৃষ্টি। যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি কি ক'রে বহু হলেন? মায়া-প্রভাবে। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'—ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেছেন। বহুরূপ তাঁর নয়, বহুরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর মায়ার প্রভাবে।

অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত

ঠাকুর বলছেন, আমি তাঁর মায়াও নিই এবং তাঁর বহুরূপকেও নিই। মায়া প্রভাবে যে বৈচিত্র্য ঘটছে তাকেও নিচ্ছি এবং সর্ববৈচিত্র্যরহিত যে অদ্বয়তত্ত্ব তাঁকেও আমি নিচ্ছি। এই হ'ল ঠাকুরের ভাব, তাঁর সর্বগ্রাহী স্বরূপ। 'সব না নিলে ওজনে কম পড়ে'—এটি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের কথা। তিনি কি শুধুই চৈতন্য? তিনি জড় নন? জড়ও যখন আমাদের অনুভবের বস্তুরূপে রয়েছে, তখন জড়ও তিনি। যিনি চিদ্‌বিশিষ্ট তিনিই অচিদ্‌বিশিষ্ট—এ বিশিষ্টাদ্বৈতের সিদ্ধান্ত। সুতরাং চিদ্‌বিশিষ্ট, অচিদ্‌বিশিষ্ট, এই উভয়কে যখন আত্মস্বরূপ ব'লে গণনা করা হচ্ছে, তখন এর একটিকে বাদ দিয়ে বললে আত্মার পূর্ণ স্বরূপকে বলা হ'ল না। তিনি জাগ্রৎ নন, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নন, বললে খানিকটা বাদ প'ড়ে গেল। তাই বলছেন, 'আমি সব নিই, নইলে ওজনে কম পড়ে।'

একজন প্রশ্ন করছেন, "ওজনে কেন কম পড়ে?" ঠাকুর সহজ ভাষায় বোঝাচ্ছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তত্ত্বটি। "ব্রহ্ম—জীবজগদ্‌বিশিষ্ট। প্রথম 'নেতি নেতি' করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং-

বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন—এই বোধ হয়, তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।" বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, একই ব্রহ্ম—তাঁর মায়া দ্বারা নিজেকে বহুধা প্রকাশমান করতে পারেন। যেমন একটি গাছ—তার ডালপালা, ফুল, ফল সব আছে, সবগুলি মিলিয়ে গাছ। গাছের গুঁড়িটার ভিতরেও গাছ আছে, আবার ফল ফুল পাতার ভিতরেও গাছ আছে। সেইরকম জাগ্রৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম—এ-সমস্ত মিলেই ব্রহ্মের পূর্ণতা অনুভব করা যায়। তাই একটিকে বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে।

বেদান্তবাদী এর উত্তরে বলেন, বাদ দিলে যদি কম পড়ে, তা হ'লে রজ্জু-সর্পের সর্পকে বাদ দিলে রজ্জু কি কম পড়ে যাবে? যখন দেখলাম এটি সর্প নয় রজ্জু; তা হ'লে রজ্জুর সত্তাতে কি কম পড়ে গেল? তেমনই জীবজগৎ বাদ দিলে ব্রহ্মের কি কম পড়ে যেত? বাস্তবে এগুলি নেই, তাই মিথ্যা বলা হচ্ছে। যা নেই অথচ প্রকাশ পাচ্ছে—যেমন সাপ নেই, কিন্তু সাপের মতো দেখাচ্ছে—এজন্য মিথ্যা বলা হয়। সেইরকম জগৎ জগৎরূপে নেই, কিন্তু জগৎরূপে প্রকাশ পাচ্ছে সেইজন্য 'মিথ্যা' বলা। তার অর্থ এ নয় যে, তা শূন্য। এক ব্রহ্মই আছেন। যাকে 'জগৎ' বলছি, তা ব্রহ্ম. 'যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমানেষঃ।' একজন লোককে দূর থেকে দেখে গাছের গুঁড়ি ব'লে মনে হচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই অনুভব যখন হ'ল, তখন মিথ্যা যেটি অর্থাৎ আরোপিত যেটি, তা দূর হ'ল; রইল যা, তা আসল বস্তু। সুতরাং বেদান্তী বলেন, ওজনে কম পড়ে না।

ঠাকুরের বিচার ও বিশ্লেষণ

ঠাকুর বহুভাবে তত্ত্বকে আস্বাদন করেছেন ব'লে বলছেন, 'কম পড়ে যায়।' তিনি বলছেন, আমি কেবল ঐ অদ্বৈতের একঘেয়ে কেন হবো?'

অদ্বৈতরূপে এবং বিচিত্ররূপে আস্বাদন তিনি করবেন। ঠাকুর বলেন, 'আমি সব খাব, ঝোলে ঝালে অম্বলে খাব।' জাগ্রতে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে আস্বাদন ক'রব ; এবং তুরীয়ে—(যদিও সেখানে আস্বাদন শব্দটি প্রযোজ্য নয় তবুও) সেখানকার অনুভবও আমার আনন্দের বিষয় হবে। তাই 'নেতি নেতি' করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। এই 'নেতি নেতি' বিচার না করলে অদ্বয়তত্ত্বে পৌঁছানো যায় না। তাই ব্রহ্ম জীব নয়, জগৎ নয়—এইভাবে বাদ দিয়ে যখন সেই স্বরূপে পৌঁছলাম যখন বাদ দেবার আর কিছু অবশিষ্ট রইল না, তখন সমস্ত আরোপ-বর্জিত সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান হ'ল। সেই অধিষ্ঠান-জ্ঞানের পর এই দ্বৈত রাজ্যে ফিরে এসে সাধক দেখে—যাঁকে এক বলেছিলাম, তিনিই বহু। বহুর ভিতর একের নির্বাধ অনুভূতি হ'তে থাকে। তিনি সব হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। বেলের সার বলতে শাঁস বোঝায়। খোলা, বিচি বাদ দিয়ে শাঁসকে বললাম, এই বেল। কিন্তু ওজন জানতে হ'লে খোলা, বিচি, শাঁস—সব নিয়ে ওজন করতে হবে। তাই ঠাকুর বলছেন, "যারই শাঁস, তারই বিচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।"

যিনি নিত্যরূপে এক অবিভাজ্য অদ্বয় তত্ত্ব, তিনি আমাদের কাছে বহুধা প্রতীত হচ্ছেন লীলায়। লীলা বলা হয় এজন্য যে, বিনা প্রয়োজনে তিনি নিজেকে বহুধা বিভক্ত করছেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে এক হয়েও বহুধা হয়েছেন। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—তিনি এক, তিনি ভাবলেন, বহু হবো। উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য কিছু নেই। 'লীলা' মানেই অপ্রয়োজন ক্রিয়া। লীলায় সেই অদ্বয় তত্ত্ব মায়া-প্রভাবে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করছেন। 'মায়া' এই জন্য বলা হয়েছে যে, বাস্তবিক বৈচিত্র্য না থাকলেও তিনি তা দেখাতে পারেন। যেমন মায়াবী তার শক্তিপ্রভাবে নানারকম খেলা দেখায়। একটি আমের বীজ পুতলো, গাছ হ'ল, ফল হ'ল, ফল খাওয়ালে। কিন্তু তারপর দেখা গেল কিছুই

নেই, এ সবই মিথ্যা, মায়াবীর শক্তি-প্রভাবে হ'ল। ভগবান্ সেই বিরাট মায়াবী, তাঁর মায়ায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাকে নানারূপে আস্বাদন করছেন। কে তিনি, যিনি এই জগৎকে নানারূপে আস্বাদন করছেন? তিনিই—বহুরূপে, জগৎ-রূপে—বীজরূপে। তিনিই সেই জড়রূপ, আর জড়রূপের অনুভবকর্তা যে চেতন, তাও তিনি। এক তিনি, বহু তিনি। ঈশ্বর তিনি, জীবজগৎ তিনি। এইভাবে সর্বত্র তাঁরই উপলব্ধি। ঠাকুর বহুবার বলেছেন, "যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।" লীলা থেকে নিত্য, নিত্য থেকে লীলা। বলছেন, "যে রাজার ছেলে, সে সাত দেউড়ি আনাগোনা করতে পারে, তার বাধা কোথায়? নিত্য থেকে লীলায় যায়, আবার লীলা থেকে নিত্যে যায়—কোন জায়গায় তার ভয় নেই।"

এই যে নির্ভয় অবস্থা, বেদান্তবাদীও তাই বলেন। জগৎকে যখন দেখেন, তখন বন্ধনের ভয় নেই; কারণ তাঁর দৃষ্টিতে সে জগতের বাস্তবতা নেই; জগৎ যেন একটা কল্পনা মাত্র, আসলে কিছু নয়। অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে যা জগৎ-রূপে প্রতীত হচ্ছে, তা ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। এই ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জগৎ-বৈচিত্র্যে তিনি মোহিত হন না। মহামায়ার মায়া তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না। তিনি এই মায়ার পর্দাকে ভেদ ক'রে স্বরূপে পৌঁছেছেন। তাই ঠাকুর বলছেন, "আমি নিত্য, লীলা—সবই লই। মায়া ব'লে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না; তা হ'লে যে ওজনে কম পড়বে।"

পাঁচ

কথামৃত—১।১৩।৬

ওঁ-কার ও জগদ্-অভিব্যক্তি

দক্ষিণেশ্বরে মহিমাদি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর 'ওঁ-কার ও নিত্যলীলা' প্রসঙ্গ করছেন। মহিমাচরণকে বলছেন, "ওঁ-কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বলো 'অ-কার, উ-কার, ম-কার,।" ঠাকুর ওঁ-কারের ব্যাখ্যা তাঁর অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান থেকে করছেন। ঘণ্টার টংকার, ট-অ-অ-ম-ম্। চারিদিক নিস্তব্ধ, টং ক'রে একটি শব্দ হ'ল, তারপর সেই শব্দটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বিরত হ'ল। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন, যেমন সমুদ্রে একটা ভারী জিনিষ পড়লে তা থেকে ঢেউ আরম্ভ হ'ল, আবার সেই ঢেউ ধীরে ধীরে সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। ঘণ্টার টং শব্দের মতো একটি তরঙ্গ আরম্ভ হ'ল, কিছুক্ষণ তরঙ্গটি চ'লল, আবার নিস্তরঙ্গ অবস্থায় ফিরে এল। ঠাকুর বলছেন, "নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সব অবস্থা এসে প'ড়ল। আবার মহা-সমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল।"

নিত্য ধরে ধরে লীলা, লীলা ধরে ধরে নিত্য—এ জিনিষটি আমাদের কাছে ঠাকুর খুব স্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী বোধগম্য রূপে বলছেন। জগৎ যখন আরম্ভ হ'ল, সেখানে যেন ঘণ্টার টংকারের মতো একটি তরঙ্গ উঠল। কিছুক্ষণ সেই তরঙ্গটি প্রবাহিত হ'ল, পুনরায় নিস্তরঙ্গ অবস্থা ফিরে এল। সেই নিত্য তুরীয় থেকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি যেন পর পর আসছে এবং আবার সেই তুরীয়ে লয় হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ

সমুদ্রেই লয় হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, "আমি 'টং' শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি …তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।"

কথাটি যে শাস্ত্রে নেই, তা নয়। শাস্ত্রে এইভাবে আছে, যখন প্রথম জগৎ সৃষ্টি হয় তখন যেন একটা শব্দের অভিব্যক্তি হয়, যাতে কোন বর্ণের অভিব্যক্তি তখনও সৃষ্টি হয়নি। একেই ওঁ-কার বলা হয়েছে। এই ওঁ-কার থেকে ক্রমে বর্ণ বিভক্ত রূপ ধারণ করলে অ-উ-ম তিনটি এল। এই বর্ণমালা যেন সৃষ্টির আদি উপকরণ অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মরূপ, যার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জগৎ-বৈচিত্র্য, নাম-রূপ সৃষ্টি হ'ল। নাম-রূপের দ্বারা সংক্ষেপে সমগ্র জগৎকে বোঝায়। ব্রহ্মের মনে জগৎ-সিসৃক্ষা এল ; তিনি ভাবলেন নামরূপের দ্বারা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করবেন। এই নামরূপ থেকে সমগ্র জগতের আবির্ভাব। ওঁ-কার সেই নামের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। মহাসমুদ্রের শান্ত জলরাশির উপর একটি জিনিস পড়ায় তরঙ্গ উঠল। সে জলরাশি চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ল, আবার ধীরে ধীরে মহাসমুদ্রে মিশে গেল। সেইরকম কারণ-সমুদ্ররূপ ব্রহ্ম, তাঁর মনে জগৎ-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগলো, আকাঙ্ক্ষাটি সমুদ্রে ভারি জিনিস পড়ার মতো, ফলে নামরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হ'ল। কারণ-সমুদ্রের তরঙ্গ নামরূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মসমুদ্র থেকে উৎপন্ন হ'য়ে তাঁর ভিতরে লীন হ'য়ে গেল। লীলা ধরে নিত্য, নিত্য ধরে লীলা, এটি বোঝাবার জন্য ঠাকুর এই উপমা দিয়েছেন।

নিত্য ও লীলা

এই জগৎ যা আমরা দেখছি, তা এসেছে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে। নিত্য থেকে লীলা, এই জগৎরূপে তিনি লীলা করছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

রূপে তিনি যেন বিভাজিত, নিজেকে বহুধা বিভক্ত ক'রে খেলা করছেন। খেলা সাঙ্গ হ'লে নিজের মধ্যে জগৎকে মিশিয়ে নেবেন। সমুদ্রের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। সমুদ্র অর্থাৎ কারণ-সমুদ্র; 'কারণ' অর্থে যা থেকে জগতের উৎপত্তি হবে। সেই কারণবারি-রূপ সমুদ্রে ভগবান্ অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন, অর্থাৎ অনন্তের সঙ্গে এক হ'য়ে আছেন। ভগবানের ইচ্ছা হ'ল, তিনি সৃষ্ট হবেন বা জগৎ সৃষ্টি করবেন। তিনি সৎ হলেন, তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য, কারণ হ'লেন—'স সচ্চ তচ্চ অভবৎ।' এই জগৎ ব্রহ্মের নামরূপ-বিশিষ্ট স্বরূপ। এই নামরূপ কিন্তু তাঁর থেকে ভিন্ন বস্তু নয়, কারণ বাইরের উপাদান দিয়ে এ জগৎ সৃষ্টি হয়নি। তিনি নিজেকেই বহুধা বিভক্ত করেছেন, না হ'লে জগৎ রচনা সম্ভব হ'ত না। নামরূপকে তিনি প্রকাশ করেছেন, আবার খেলা সাঙ্গ হ'লে তাকে নিজের ভিতর উপসংহৃত করছেন। সংহার' অর্থ তাঁর নিজের ভিতর নিয়ে নেওয়া। ঊর্ণনাভ বা মাকড়সার দৃষ্টান্তে জগতের সংহার বোঝানো হয়, 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ' (মু ১. ১. ৭)—যেমন ঊর্ণনাভ নিজ শরীর থেকে সূতা উৎপাদন ক'রে আবার নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেই রকম ভগবান্ নিজেকে জগদ্রূপে প্রকাশিত ক'রে আবার সেই জগৎকে নিজের ভিতর উপসংহৃত ক'রে নেন। যেমন কুম্ভকার মাটি দিয়ে ঘট করে, সেই ঘট ভাঙলে মাটিতে পরিণত হয়, সেই রকম তিনি হচ্ছেন জগতের উপাদান কারণ; তাঁর থেকে জগৎ সৃষ্টি এবং তাঁর মধ্যেই জগতের পরিসমাপ্তি। উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ—দুই-ই তিনি। তিনি যদি চেতন না হন, তা হ'লে এই সৃষ্টির যে সুন্দর প্রযোজনা, একটা প্ল্যান (পরিকল্পনা)—তা কোথা থেকে হবে? জড়বস্তু বুদ্ধি দিয়ে কিছু করতে পারে না। অতএব চেতনের সঙ্গে সংযোগ না হ'লে, জড়বস্তু জগৎরূপে পরিণত হ'তে পারে না। তাঁকে বলা হয়েছে, 'কারণং

কারণানাম্'—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই তিন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কারণও তিনি। 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্'—সমস্ত জগৎই তিনি। নিত্য না থাকলে লীলা কোথা থেকে আসবে এবং কোথায়ই বা ফিরে যাবে?

জগতের নিত্য ও লীলা কল্পনার কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে জগৎকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করেছি, তাকে অস্বীকার করতে পারি না। সর্বক্ষণ সজাগ ক'রে দিচ্ছে—আমি আছি, আছি, আছি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের মধ্য দিয়ে জগৎ আমাদের তার অস্তিত্ব স্মরণ করাচ্ছে। জগতের আদিকে দেখিনি, কিন্তু তার ভিতর থেকে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করছি। প্রশ্ন উঠছে, এই পরিবর্তনশীল জগৎ অনাদি? সান্ত? জগতের প্রতিটি বস্তু ব'লে দিচ্ছে যা পরিবর্তনশীল, তার আদি আছে, অন্ত আছে। জগৎ যদি পরিবর্তনশীল হয়, তার আদি অন্ত আছে। আদি কল্পনার সময়ে লীলাকে ধরে নিত্যে যাওয়া হয়। ভাগবতে, উপনিষদে বর্ণনা আছে—স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বস্তুতে কারণে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে সব এক মহাকারণে লীন হয়। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে বিষয় পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্—এদের বিশ্লেষণ করে স্থির করা হয়েছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ 'বিষয়'-বিশিষ্ট এই পৃথিবী। মাটি জল—যাতে তেজ, বায়ু, আকাশ এই ক্রমে সূক্ষ্মতর হ'য়ে যাচ্ছে। এখন আকাশকে সূক্ষ্ম বললেও আকাশেরও উৎপত্তি ও লয় আছে। তার উৎপত্তি ও লয় অব্যক্ত। 'অব্যক্ত' অর্থাৎ অনভিব্যক্ত। গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শংকরাচার্য উদ্ধৃত করেছেন:

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

নারায়ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাঁ থেকে জগৎকারণ 'অব্যক্ত'। সেই

পরম কারণ অব্যক্ত থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডরূপ, বাইরে তাঁর বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি তখনও হয়নি, অথচ সমস্ত অভিব্যক্তির সম্ভাবনা তাঁতে রয়েছে, ডিমের ভিতর যেমন সংকুচিত বা অব্যক্তভাবে জীব থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, সমস্ত জগৎ। উপনিষদ্ বলছেন :

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
> মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

(কঠ, ১. ৩. ১০-১১)

ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে 'পর' বা ব্যাপকতর হচ্ছে অর্থ বা সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূত থেকে ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হয়েছে। বিষয় ইন্দ্রিয়কে অনুভূতি যোগায়, সুতরাং বিষয় ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আরো সূক্ষ্মতর। 'অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ'—সেই সূক্ষ্মভূতের থেকে ব্যাপকতর হ'ল মন। এইভাবে মন থেকে সূক্ষ্মবুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে মহান্ আত্মা। জগতের সূক্ষ্মকারণরূপকে 'মহৎ' বলা হয়েছে তাই মহান্। 'মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্'—মহতের পরেও আছে অব্যক্ত 'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ'—অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ বলতে ব্রহ্ম। 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ'—পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'—সেই পুরুষই পরমতত্ত্ব, চরম লক্ষ্য। এইভাবে লীলা থেকে নিত্যে পৌঁছানো গেল।

এর বিপরীতক্রমে নিত্য থেকে লীলা, উপনিষদে বলা হয়েছে—আত্মা থেকে আকাশ এবং তার থেকে পর্যায়ক্রমে বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি হ'ল। ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে স্থূলত্ব প্রাপ্তি হচ্ছে। নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য, ঠাকুর একে 'অনুলোম বিলোম' বলছেন।

লীলার ভিতর আমরা বহুধা বিভক্ত জগতে রয়েছি, কারণে পৌঁছতে হ'লে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকারণে যেতে হবে। যেন এগুলি শিকলের বিভিন্ন কড়ি যা ধরে ধরে আমাদের মূলে উপনীত হতে হবে। সেজন্য শাস্ত্র এতভাবে জগতের উৎপত্তি আদি বলেছেন। মাণ্ডুক্যকারিকাতে মৃত্তিকার বা উপনিষদে লোহা অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে সৃষ্টির কথা নানাভাবে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অবতারণা করবার জন্য। এগুলি লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়, আমরা যাতে সৃষ্টির ক্রমচিন্তা ক'রে তার বিপরীত প্রথায় অগ্রসর হ'য়ে সেই পরম কারণে পৌঁছতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে সৃষ্টি ব'লে কিছু না থাকলেও শাস্ত্র সেই সত্যে পৌঁছবার জন্য এগুলি অবলম্বন করেছেন।

'সৃষ্টি' বলতে কিসের সৃষ্টি? যে সৃষ্টিকে বহুধা বিভক্তরূপে দেখছি, তা যদি তত্ত্বের বহুধাবিভক্তি হ'ত, তা হ'লে তার কারণকে খুঁজে পেতাম না। কারণ যে বস্তু সগুণ, সে নির্গুণে পৌঁছে দিতে পারে না; এবং যা নির্গুণ, তা নিজেকে সগুণ করতে পারে না। নির্বিশেষ সবিশেষ আবার সবিশেষ নির্বিশেষ হ'তে পারে না। এরা বিপরীতধর্মী বস্তু, পরস্পরবিরোধী, এজন্য একে 'মিথ্যা' বলা হয়। 'মিথ্যা' মানে এর বস্তুতঃ কোন সত্তা নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬. ১. ৪) আছে: যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। একটি মাটির ঢেলাকে জানলে তা থেকে সৃষ্ট মাটির তৈরী সব বস্তুকে জানা হ'য়ে যায়; কারণ, মাটির বিভিন্ন আকার-পরিবর্তন মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রূপান্তরিত বিকারগুলি শব্দাত্মক বা বাক্যমাত্র-অবলম্বন, এদের নামমাত্র আছে, পৃথক পৃথক্ সত্তা কিছু নেই। সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, মৃন্ময় বস্তু মৃত্তিকারই বিকার। কারণটি সত্য, কার্য মিথ্যা,। জগৎ মিথ্যা

ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, তিনি এক হয়েও বহুরূপে নিজেকে দেখাতে পারেন, তাতে দোষ হয় না। তিনি বহু—এ-কথা বেদান্ত কদাপি বলেন না। বাস্তবিক তিনি যদি বহু হ'তে পারতেন, তা হ'লে তাঁর নিত্যত্বের হানি হ'ত। তিনি নিত্য হয়েও বহুরূপে প্রকাশিত, অতএব এই প্রকাশ-বৈচিত্র্য মিথ্যা। জগতের একমাত্র কারণ যিনি, তিনিই সত্য। জগতের আর সব বস্তু তাঁর বিকার মাত্র। নামরূপ তা থেকে অভিন্ন। সুতরাং এই জগৎকে ব্রহ্মে পর্যবসিত ব'লে জানতে হবে। ব্রহ্মে এই জগৎকে লীন করতে পারলে মানুষ এই নামরূপের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। নামরূপের অতীত না হওয়া পর্যন্ত জন্মমৃত্যুর পরম্পরা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি

সৃষ্টির কথা জেনে আমাদের লাভ নেই; কারণ তার দ্বারা বিজ্ঞানের মতো জগৎকে কাজে লাগাবার কৌশল আমরা আবিষ্কার করছি না। সাধক সৃষ্টির কারণ জানতে চান, ভোগের উপকরণ আবিষ্কার করার জন্য নয়। বিজ্ঞানী জগৎকে জেনে কৌশলে ভোগের উপকরণ করতে চান, আর জ্ঞানী জগতের পশ্চাতে মূল তত্ত্বকে জানতে চাইছেন, যাতে তাঁকে ধরে নিত্যে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। ঠাকুর বলছেন, লীলাকে ধরে নিত্য। নিত্য সত্য, লীলা ভ্রমমাত্র। লীলার বৈচিত্র্য যত আপাত-মনোরম হ'ক বাস্তবিক তার নিত্যের অতিরিক্ত সত্তা নেই। মৃত্তিকা যতই বিকার প্রাপ্ত হ'ক, আসলে তা মৃত্তিকা। জ্ঞানী বলেন, বিবিধ বস্তুকে জানার প্রয়োজন কি? বস্তুগুলি সত্য হ'লে জানার সার্থকতা থাকত। আমাদের মনে কত রকমের আকাশকুসুম কল্পনা ভাসে, সেগুলির তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বিচার করতে যাই না। সেইরকম এই জগৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আকাশকুসুমের মতো মিথ্যা কল্পনা মাত্র, এর

কোন অস্তিত্ব নেই। মৃন্ময় বস্তুগুলিতে মৃত্তিকার অতিরিক্ত সত্তা নেই ; যদি থাকত, তা হ'লে মৃত্তিকার সংশ্লিষ্টরূপে ছাড়া অন্যরূপে দেখতে পেতাম। তা তো দেখি না। সেই রকম, এই জগতে ব্রহ্মের যে বহু প্রকাশ, সেগুলি তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই। অতএব ব্রহ্মকে জানলে তাঁর মিথ্যারূপ প্রকাশগুলিকে জানবার দরকার কি ? মিথ্যাবস্তুকে জেনে মিথ্যা জ্ঞান হয়, তা কখনো আমাদের পরম কল্যাণ আনতে পারে না। মোক্ষলাভ—সত্যজ্ঞান দ্বারাই সম্ভব হয়।

মৃত্তিকা ছাড়া নরুনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬. ১. ৬) ঃ যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি॥ অর্থাৎ একটি নরুণকে যদি লোহানির্মিত ব'লে জানি তা হ'লে লৌহময় সমুদয় বস্তুকে জানা হ'য়ে যায় ; বিকার শব্দাত্মক—নামমাত্র, লৌহই সত্য, অন্যবস্তুগুলি তার বিবর্তন। বিজ্ঞানী বলছেন, মাটির যে বিভিন্ন আকার আমাদের অনুভূত হচ্ছে, সেগুলিকে মিথ্যা বলতে পারি না। দার্শনিক বলছেন, যদি সেগুলির মৃত্তিকাতিরিক্ত সত্তা থাকত, তা হ'লে মৃত্তিকা ছাড়াও তাদের দেখা যেত। কিন্তু তা দেখা যায় না—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা তদভাবে তদভাবঃ।

আর একটি উপমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর হবে। দড়ি থাকলে সাপকে সেখানে দেখা যায়, দড়ি না থাকলে দেখা যায় না। দড়ি সব সময় আছে তাই সত্য ; সাপ কখনো দেখা যায়, কখনো যায় না। দড়িরূপ আধার না থাকলে ভ্রম হয় না। যিনি ভ্রমের অধিষ্ঠান, তিনিই হলেন সত্য ; যিনি এই জগতের উপাদান, যে উপাদান বিকার থেকে ভিন্ন নয়, তিনিই আত্মা, আর হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই আত্মা, 'তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'॥ (ছান্দোগ্য ৬. ৮. ৭)

"আত্মা আমা থেকে ভিন্ন হ'লে তাকে জেনে জ্ঞানের ভাণ্ডার একটু

বাড়ত বটে, কিন্তু জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হ'ত না। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই বলার অর্থ—সেই ব্রহ্ম বিভিন্ন প্রকারে বহুধা বিভক্ত রূপে প্রতীত হওয়া সত্ত্বেও তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু। তোমার যে-সব পরিবর্তন প্রতীতি হচ্ছে তাদের পশ্চাদ্‌বর্তী সত্তা নির্বিকার, নির্বিশেষ এক নিত্য সত্য। এইভাবে আত্মাকে জানলে আর দুঃখের কোন কারণ থাকে না। তাই শ্রুতি বলছেন :

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥ (বৃহ. উ. ৪. ৪. ১২.)

ভ্রমজ্ঞানে নয়, এই স্বরূপে আত্মাকে যদি কেউ জানে তা হ'লে সে সমস্ত বন্ধনের অতীত হয়ে যায়। যদি সেই সত্যজ্ঞান হয়, তার স্বরূপকে যদি সে জানতে পারে, তা হ'লে সে কিসের কামনায় কাহার প্রয়োজনে শরীরের সমস্ত দুঃখ ভোগ করবে? শাস্ত্রের সৃষ্টি-আদি ব্যাখ্যার এইটি তাৎপর্য।

লীলার সার্থকতা

এখন প্রশ্ন ওঠে, ভগবানের এই লীলা কি প্রয়োজনে? জগৎ-সৃষ্টি তিনি করলেন কেন? যদি সৃষ্টি না করতেন, তা হ'লে জগৎ-কারণকে আমরা খুঁজে পেতাম না। জগৎ-কার্যকে পাচ্ছি বলে একে ধরে ধরে জগৎ-কারণে পৌঁছতে পারছি। আমাদের স্বরূপকে খুঁজে বার করবার জন্য এই সৃষ্টি। চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটা হাঁড়ি রাখা হয়েছে। চোখবাঁধা অবস্থায় খুঁজে লাঠি দিয়ে হাঁড়ি ভাঙতে হবে। হাঁড়ি ভাঙা হ'লে খেলা শেষ। তখন চোখের বাঁধন খোলা হয়ে যাবে। আমরাও সেইরকম জগতের ভিতর সত্যকে খুঁজে পাবার জন্য লাঠির বাড়ি মারতে মারতে চলেছি, হাঁড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক সময়েই লাঠিটা অন্যত্র লাগছে, হাঁড়িতে নয়। কতকাল

এইভাবে চলেছি, জানি না। চলতে চলতে কেউ আমাকে ইশারা করে দিলে, হাত ধরে দেখিয়ে দিলে 'এদিকে যাও'। হয়তো তারপর লাঠিটা হাঁড়ির উপর প'ড়ল। এতক্ষণে হ'ল আমার নিষ্কৃতি। ঠিক এই রকম কার্যের অরণ্যের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা, বেড়াতে বেড়াতে যদি কারণেতে পৌঁছতে পারি। এই জগৎটা তাতে কিছু সাহায্য করবে, না হ'লে কাকে ধরে ধরে আমরা কারণে পৌঁছব?

অনেক সময় মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই চোখে ঠুলি পরে ঘোরার কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন যে কি তা আমরা জানি না, কেবল জানি—তার অন্তে পৌঁছবার উপায় আছে। তাই আদিতে কি হ'ল, কেন জগৎ সৃষ্টি হ'ল, এ প্রশ্নের বিচারে আমাদের কোন উপকার নেই। জগৎ আমাদের একটা খাঁচার ভিতর পুরে ফেলছে, তার থেকে বের হবার উপায় জানতে হবে। শাস্ত্র বলছেন, এর উপায় হ'ল 'লীলা'। লীলা ধরে নিত্যে পৌঁছানোর উপায় ক'রে দিচ্ছে জগৎ,—'উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন'। পরমজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য এই উপায়। সেই তত্ত্বজ্ঞানের যাতে উৎপত্তি হয়, তাই এই জগতের বর্ণনা। বেদান্তে কোথাও পঞ্চভূতের উৎপত্তি বলেছেন; কোথাও আবার তেজঃ অপ্ অন্ন সৃষ্টির কথা বলেছেন। ব্যাখ্যাকার শঙ্করাচার্য বলেছেন, সৃষ্টি তিনটি হ'ক, পাঁচটি হ'ক বা তিনশই হ'ক তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের যা জানতে হবে, তা হ'ল মূল তত্ত্ব, মূল স্বরূপ। আর এই জানাই আমাদের দেখিয়ে দেবে এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ।

ছয়

কথামৃত—১।১৩।৬

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে। ঠাকুর বলছেন, "সংসারীরা বলে, কেন কাম-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না?" ভক্তের মনে সাধারণতঃ প্রশ্ন জাগে, কেন বিষয়াসক্তি মন থেকে যায় না? ঠাকুর বলছেন, "যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহ'লে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়য় না।"

ঈশ্বরচিন্তা ও অনাসক্তি অর্জন

একরকম বৈরাগ্য আছে, যেখানে মনকে বিষয় থেকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা ক'রে সংযম অভ্যাস করতে হয়। ঠাকুরের ভাষায়, নাক মুখ টিপে বৈরাগ্য। কোন রকম ক'রে ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলে কিছুটা ফল হয়, কিন্তু আসক্তি দূর হয় না। তাই প্রশ্ন ওঠে, এই আসক্তি দূর করার উপায় কি? উপায় গীতা বলছেন, পরমতত্ত্বকে দর্শন করলে সেই ভোগাসক্তি নিবৃত্ত হয়। তাঁকে দর্শন করলে, লাভ করলে ইন্দ্রিয়াসক্তি যায়। কেন যায়? তার উত্তর ঠাকুর অন্যত্র দিয়েছেন। বিষয় একটি ছোট চুম্বক ও ভগবান্ একটি বড় চুম্বক। যদি দুদিকে দুটি চুম্বক রাখা যায়, তাহলে মন কোন্ দিকে যাবে? যে চুম্বকের শক্তি বেশি, সেটিই আকর্ষণ করবে। ভগবান্ সেই রকম বড় চুম্বক; জীব যদি তাঁর দিকে আকর্ষণ বোধ করে, তা হ'লে আর অন্য দিকে মন দিতে পারবে না। ভাগবতে একটি সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা আছে। ভগবান্ যখন বংশীধ্বনি করছেন, তখন গোপীগণ স্ব স্ব গৃহকর্ম পরিত্যাগ ক'রে

তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। কেউ রন্ধনে ব্যাপৃতা ছিলেন, কেউ পতিসেবা করছিলেন, কেউ সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন, কেউ প্রসাধনরতা ছিলেন, এমনি নানা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকাকালে বংশীধ্বনি শুনেই সকলে তাঁর দুর্বার আকর্ষণে ছুটলেন। গৃহকর্ম, পরিজনদের প্রতি কর্তব্য ভগবানের আকর্ষণের কাছে অতি তুচ্ছ। সে আকর্ষণকে প্রতিরোধ করতে পারে—এমন কোন প্রবলতর আকর্ষণ নেই। ঠাকুরের অনুপম ভাষায় "বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহ'লে আর অন্ধকারে যায় না।"

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রাবণের কথা বলছেন। রাবণ সীতার মন হরণ করার জন্য নানা রূপ ধারণ করছেন। কেউ বললে, 'তুমি মায়াবী, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন? সীতা ভুলে যাবেন।' তখন রাবণ উত্তরে বলছেন, "তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ," যখন রামরূপ চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়ে যায়, তা পরবধূ সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা আর কি ক'রে থাকবে? যত ভগবানের চিন্তা হবে ততই সংসারে ভোগের আসক্তি কমবে। যত পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই পশ্চিম দিক দূরে সরে যায়। তখন বিষয় আপনা থেকেই নিবৃত্ত হবে। বিষয়ের আর মনকে আকর্ষণ করার সাধ্য থাকবে না। ঠাকুরের ভাষায়, 'সব আলুনি হ'য়ে যায়।' আর একটি দৃষ্টান্ত তাঁর—মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের দিকে মন যায় না।' ভগবান্ লাভের পরও যদি কেউ সংসারে থাকে তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে। গীতা বলছেন, 'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'—সেই যোগী যেখানেই থাকুন, সর্বদা শ্রীভগবানেই থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিলেন। ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়, "তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে ততই বিষয়-বাসনা কমে যাবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে

ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো, জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে।"

ভক্তের আচরণ ও আদর্শ

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের মধ্যে দুটি বিভাগ ছিল—ত্যাগী ও সংসারী। উভয়ের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যেও এই রকম মধুর সম্বন্ধ দেখা গেছে। কারণ গৃহীরা জানেন ত্যাগী সন্তানগণ ঠাকুরের প্রাণস্বরূপ। অপরদিকে ত্যাগী সন্তানগণ জানেন, গৃহীরা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। প্রত্যেক ভক্তেরই ভগবানের সঙ্গে এই রকম মধুর সম্পর্ক হ'লে সংসারের সঙ্গে বিরোধ থাকে না। রায় রামানন্দ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে তিনি গৃহস্থ ছিলেন। ভগবানের লীলা অভিনয় করার সময় তিনি নিজ হাতে দেবদাসীদের সাজিয়ে দিতেন। আমাদের হয়তো মনে হবে, এ কিরূপ আচার! কিন্তু তিনি স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধিরহিত হয়ে দেবদাসী যে ভূমিকায় অভিনয় করবে সেইরূপে তাঁকে দর্শন করছেন। অবশ্য মন খুব উঁচু সুরে বাঁধা না থাকলে তা সম্ভব নয়। অন্য কেউ এই আচরণ অনুকরণ করলে তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা বলি—কোন এক দেবদাসী, মন্দিরে 'গীত গোবিন্দ' গান করছেন। মহাপ্রভু ভাবাবস্থায় সেই গান শুনে (তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য) তাঁর দিকে ছুটছেন। সেবক গোবিন্দ পথরোধ করলেন প্রভুকে আলিঙ্গন ক'রে। মহাপ্রভু ভাবের ঘোরে পথ চলেন, তাই গোবিন্দ সদা-সতর্ক প্রহরীরূপে রয়েছেন পাশে পাশে। ভাব উপশম হ'লে মহাপ্রভু বলছেন 'এ সন্ন্যাসীর দেহ, তুমি আজ রক্ষা করলে। জ্ঞান ছিল না, ভাবের ঘোরে যদি দেবদাসীকে আলিঙ্গন করতাম, তৎক্ষণাৎ এ দেহকে পরিত্যাগ করতে হ'ত।' এই রকম ভাববিভোর অবস্থাতেও

মহাপ্রভু বলছেন তাঁকে দেহ ত্যাগ করতে হ'ত! এ দৃষ্টান্ত না থাকলে অনধিকারীর হাতে পড়ে আদর্শ অবনত হয়ে যায়। ত্যাগী ও গৃহী উভয়ের আদর্শ নিষ্কলঙ্ক রাখতে হবে। একদিকে মহাপ্রভু ত্যাগীর দৃষ্টান্ত, অন্য দিকে গৃহীর দৃষ্টান্ত, রায় রামানন্দ।

ঠাকুর 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখতে গিয়েছেন। তখন অভিনেত্রীরা ছিলেন বারবনিতা। তাদের অভিনয় কেমন দেখলেন? ঠাকুর বলছেন, 'আসল নকল এক দেখলাম।' এই দৃষ্টি ভাবের ঘোরে হয়। ঠাকুর বারবনিতাকে দেখছেন সাক্ষাৎ "মা আনন্দময়ী" রূপে। কিন্তু তবু ব্যবহারে তাঁকেও এখানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, যাতে সমাজে কোনরূপে নৈতিক অবনতির সম্ভাবনার সুযোগ না আসে। দেহবুদ্ধি না থাকলেও তাঁদেরও এতখানি সতর্ক থাকতে হয় সমাজ-কল্যাণের আদর্শ স্থাপনের জন্য।

সাত

কথামৃত—১।১৩।৬

মহিমাচরণকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, "যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর স্বপ্নবৎ বলো, তার ভক্তি যাবার নয়। ঘুরে ফিরে একটুখানি থাকবেই। একটা মুষল সেনা বনে পড়েছিল, তাতেই 'মুষলং কুলনাশনম্'।" যে প্রকৃত ভক্ত তার হৃদয়ে ভক্তি বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছে। "জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হু হু ক'রে বেড়ে যায়।" ঠাকুর এ-সম্পর্কে ভক্তদের মধ্যে শিব-অংশ ও বিষ্ণু বা নারায়ণ-অংশ ব'লে দুটি বিভাগ করতেন। শিব-অংশে জ্ঞান, বিষ্ণু-অংশে ভক্তি—নিজ নিজ প্রকৃতি

অনুসারে ভিতরে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। সুতরাং নিজভাব কেউ পরিত্যাগ করতে পারবে না। বেনা বনে একটি মুষল পড়েছিল, তাতেই যদুবংশ ধ্বংস হ'য়ে গেল

ভক্তি অবিনাশ্য

এখানে যদুবংশের একটি কাহিনী আছে। মুনিঋষিদের উপহাস করবার জন্য যাদবরা শাম্বকে নারী সাজিয়ে বললেন, 'বলুন তো এর কি সন্তান হবে?' একটু কৌতুক করা ওদের উদ্দেশ্য ছিল। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ঋষি বললেন, 'প্রসব করবে মুষলং কুলনাশনম্'। এ যদুকুল ধ্বংস করবার জন্য মুষল প্রসব করবে। সকলে ভীত হয়ে শাম্বর বেশ পরিবর্তন করাতে গিয়ে দেখল একটি মুষল বের হয়েছে। যাদবরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন প্রভাস-তীর্থে স্নানাদি ক'রে ব্রহ্মশাপ খণ্ডন করতে। কিন্তু মুষলটির কি হবে? শ্রীকৃষ্ণ তাকে ঘসে ঘসে ক্ষয় করতে বললেন। তা করতে গিয়ে কিছুটা ঘসা অংশ জলে প'ড়ে সেখানে শরবন হ'য়ে গেল, যেটুকু ক্ষয় হয়নি সেটুকু জলে ফেলা হ'ল। কিন্তু অব্যর্থ ব্রহ্মশাপ। এর পরের কাহিনী অন্যরূপ। যদুবংশের সন্তানগণ মত্ত হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ সুরু ক'রল সেই শর দিয়ে। আর তাতেই তারা ধ্বংস হ'ল।

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অংশটি একটি মাছ খেয়েছিল। জরা-নামক ব্যাধ ঐ মাছের পেট থেকে লোহার টুকরোটি পেয়ে তীরের ফলা তৈরী ক'রল। ইতিমধ্যে ভগবান দেখলেন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ, যদুকুল ধ্বংস হয়েছে। ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হ'য়ে যদুবংশ প্রবল প্রতাপশালী হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে দুর্নীতিও প্রবেশ করছিল। এরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকলে জগতের অকল্যাণ হবে। লীলাসংবরণ করার আগে এদের ধ্বংস ক'রে যাবেন, ভগবানের এই উদ্দেশ্য ছিল। বেনা যেমন

সমুদ্রকে সংযত ক'রে রাখে, তেমনই ভগবান এদের শক্তিকে সংযত ক'রে রেখেছিলেন। তিনি লীলাসংবরণ করেই এরা জগতে প্রলয় সৃষ্টি ক'রত।

যদুবংশ ধ্বংসের পরের বর্ণনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভগবান একটি গাছে হেলান দিয়ে ব'সে আছেন। তাঁর কর্তব্য অবশিষ্ট কিছু নেই। গীতা বলা হ'য়ে গিয়েছে, উদ্ধবকে উপদেশ দান করা হ'য়ে গিয়েছে। উদ্ধব সকলকে হরিনাম শোনাবে। ইতিমধ্যে জরা-নামক সেই ব্যাধ দূর থেকে তাঁর পীতবসন দেখে মৃগ মনে ক'রে তীর ছুঁড়েছে। তীরটি ভগবানের শ্রীচরণ বিদ্ধ করে। ব্যাধ এসে দেখে আহত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কাতর হ'য়ে কাঁদে, 'প্রভু আমি এ কি করলাম?' ভগবান তাকে এই বলে শান্ত করেন যে, তাঁর লীলাসংবরণের একটা উপলক্ষ্য চাই। তাই তার কোন দোষ নেই।

সংস্কার ও সাধন পথ

সেইজন্য বলা হয়, 'মূষলং কুলনাশনম্'। এই কাহিনীর গূঢ় অর্থটিকে ঠাকুর বলছেন, ভক্তের হৃদয়ে যদি ভক্তি থাকে জ্ঞানরূপ পাথরে যতই ঘষা হ'ক সে ঐ মুষলের মতো, যাবার নয়। ভিতরে একটু থাকে, আবার তা ফুটে ওঠে। এজন্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঠাকুর বলতেন, তোমার ভিতরে ভক্তির বীজ রয়েছে, তোমাকে ভক্তির পথে ফিরে আসতে হবে। অদ্বৈতের বংশ তার বীজ যাবে কোথায়? বিষ্ণু-অংশে যার জন্ম, সে যে পথেই চলুক না কেন, ভক্তির পথে তাকে ফিরে আসতেই হবে। এইভাবে ভক্তদের কার কোন পথ, তা নির্দেশ ক'রে ঠাকুর তদনুসারে উপদেশ দিতেন। তা না হ'লে শক্তির অনেক অপচয় হ'য়ে, সময় অপব্যয়িত হ'য়ে যায়। এখানে ঠাকুর যে শিব-অংশ এবং বিষ্ণু-অংশ বললেন, তার দ্বারা আমরা যেন এ দুটি অংশকে অত্যন্ত

পৃথক্ না মনে করি। বাস্তবিক এ-দুটি অংশ দুটি ছাঁচ, একই উপাদানে প্রস্তুত, একই বস্তু। পরমেশ্বর এক রূপে শিব, অন্য রূপে বিষ্ণু—এইভাবে লীলা করছেন। তাঁর অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত রূপবৈচিত্র্য। আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হ'ল। জ্ঞান কিংবা ভক্তি—যার যেদিকে প্রবণতা ঠাকুর তাকে সেই পথে যেতে উৎসাহিত করতেন, কারণ প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব পথে চললে সাধকের কল্যাণ হবে।

আট

কথামৃত—১।১৩।৬

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করছেন। রাবণ বলছেন, রামরূপ চিন্তা করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়ে যায়, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি কোথায় থাকে? এ-কথায় মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি রামরূপ চিন্তা করা বা রামচন্দ্রের উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে উচ্চ হ'ল? আসলে এখানে উঁচু নীচু অথবা শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের কথা নয়। শাস্ত্র বলে, 'অন্যনিন্দা অন্যস্তুতয়ে'—একটির নিন্দা করা হয় অন্যটির স্তুতির জন্য। তাছাড়া অতিশয়োক্তিও আছে। শুধু অধ্যাত্ম শাস্ত্রে নয়, অলঙ্কার-শাস্ত্রেও আছে। কথা বলবার সময় জোর দেবার জন্য এসব বলতে হয়। তাই রামরূপ চিন্তা করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় বলতে এখানে ব্রহ্মপদ মানে ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্তি। ভক্ত ব্রহ্মস্বরূপতা পেতে চান না, তিনি ঈশ্বর থেকে পৃথক্ হয়ে ঈশ্বরকে আস্বাদন করতে চান। যেমন রামপ্রসাদ বলেন, চিনি হতে চাইনা মা, চিনি খেতে ভালবাসি। এটি হচ্ছে ভক্তের রুচি, ভক্ত এইভাবে ভগবানকে আস্বাদন করতে চান।

সাধকের বিভিন্ন প্রকৃতি

এখন ভক্তের কাম্য যে অবস্থাটি আর ব্রহ্মজ্ঞানের যে অবস্থা—দুটিতে তুলনা করা যায় না। কারণ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞান চায়, ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞান চায় না, ভক্তি চায়। কোনটি বড়, কোনটি ছোট—এ প্রশ্ন আসে না। এখানে তিনিও যেমন নিত্য, তাঁর লীলাও তেমনি নিত্য। যে যে-স্বরূপটি চায় তার কাছে সেটি বড়। যে যে-ভাব চায়, সেই ভাবটি তার কাছে উৎকৃষ্ট। তার অন্য ভাব আস্বাদন করতে যাওয়া অনধিকার চর্চার মতো। আর তার তা মনঃপূতও হয় না। হনুমানের দাস্যভাব। তাঁকে যদি বলা হ'ত, আপনি কেন মধুরভাবে আস্বাদন করেন না, তিনি হয়তো বলতেন, ও-ভাব আমার কাম্য নয়, ওতে আমার রুচি নেই। যদিও ভক্তি-শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এগুলি ক্রমশঃ একটির থেকে আর একটি শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, তবুও শাস্ত্র বলেছেন : যে যেটি অবলম্বন করে, তার কাছে সেটি শ্রেষ্ঠ। হনুমানের কাছে রামরূপ শ্রেষ্ঠ, তাঁর কাছে সেজন্য ব্রহ্মপদ তুচ্ছ। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মপদই একমাত্র কাম্য, সে দৃষ্টিতে রামরূপ তাঁর কাছে তুচ্ছ।

এখন কোনটি তুচ্ছ আর কোনটি শ্রেষ্ঠ, তা হিসেব ক'রে স্পষ্টভাবে বলা যায় না। যদিও তা বলার চেষ্টা হয়েছে এবং তা নিয়ে আবহমান-কাল ধ'রে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এ বলে, আমার ভাবই শ্রেষ্ঠ ; ও বলে, আমার ভাব। আসল কথা—ভগবানের মতো তাঁর ভাবেরও ইতি করা যায় না। যে যে-ভাবটি নিয়ে থাকে, সে তার তল পায় না। ভগবানের আস্বাদন ক'রে তাকে নিঃশেষ করা যায় না। সুতরাং শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের বিচার অবান্তর। যে-ভাবে তিনি ভক্তের আস্বাদ্য হন, তার কাছে সেটি উৎকৃষ্ট ; কারণ সেটি তিনি চান। তাই দেখা যায়, ঠাকুর তাঁর পার্ষদদের মধ্যে একজনের অনুসৃত ভাব অন্যকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন, বলছেন, ওটি তোর ভাব নয়। তাঁর ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে যেমন

বিভিন্ন রকম ব্যবহার করেছেন, তিনিও তাঁদের প্রতি সেইরকম করতেন। যার যেটি ভাব তাকে তিনি সেটি রক্ষা ক'রে চলতে বলতেন। কোন জায়গায় তার ব্যতিক্রমের চেষ্টা দেখলে সতর্ক করতেন। সেটি উচ্চ কি নীচ, তা বলতেন না, বলতেন, 'ও তোর ভাব নয়'। ব্রহ্মপদের তুচ্ছত্ব এখানে বর্ণনীয় নয়, একটির স্তুতির জন্য অন্যটির নিন্দা করা হচ্ছে। ব্রহ্মপদের নিন্দা করা হচ্ছে রামরূপের স্তুতির জন্য। অনুরূপ ভাবে বলা হয়, জ্ঞানীর কাছে রামরূপ তুচ্ছ। নিরপেক্ষ কোন ভাবই নেই। যার যে আদর্শ সেটি তার ভাব, সেটিকে অবলম্বন ক'রে তাকে চলতে হবে। আর কোন ব্যক্তি বা সাধকের অপেক্ষা না ক'রে কেবল স্বরূপের কথা বলতে গেলে কিছুই বলা যায় না, কারণ সিদ্ধের পক্ষে ভক্ত-ভগবান, উপাস্য-উপাসকের প্রশ্নই নেই। উপাস্য ভগবানের বৈচিত্র্য থাকবে এবং উপাসক তাঁর থেকে ভিন্ন হবে—এ আমরা বুঝি। ব্রহ্ম যখন উপাস্য হলেন, তখন যে সাধক ব্রহ্মের উপাসনা করছে সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই জন্যই সে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। সুতরাং সে তার থেকে ভিন্ন, অন্ততঃ এ প্রতীতি হয়েছে। কিন্তু যদি সে উপাসনা বা জ্ঞান চর্চা করেই হ'ক বা অন্য ভাবেই হ'ক তার ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে, সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। এই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ার আগে পর্যন্ত সে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়ে রয়েছে। না হ'লে কে কার উপাসনা করবে? প্রত্যেকের নিজের পথের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে পথকে দৃঢ় সত্য ব'লে ধরতে হবে। নিজের পথের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কেউ এগোতে পারে না। কারণ কোন উপাসক যদি তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখে সবই মিথ্যা, সে কি বলবে, মিথ্যারূপ মা কালী, তুমি আমাকে এটা দাও, ওটা দাও? মিথ্যা বস্তুর কাছে কি কেউ প্রার্থনা করবে? সুতরাং এটি তার দৃষ্টি নয়। যে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করছে সে কি বলবে,

'আমার অনুশীলন মিথ্যা?—যার দ্বারা আমি ব্রহ্মকে উপলব্ধি ক'রব।' একি কখনও হয়? সে তার অনুশীলনকে সত্য ব'লে মেনে নিয়েই এগোবে। সেখানে উঁচু নীচু ব'লে কোন পার্থক্য নেই। স্ব স্ব ভাব অনুসারে আস্বাদন করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি ও উপদেশ

এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন—'আমি ঝালেও খাই, ঝোলেও খাই, অম্বলেও খাই। আমি এক-ঘেয়ে নই। আমার এক-ঘেয়ে ভাব পছন্দ হয় না, সর্বভাবে তাঁকে আস্বাদন করতে চাই। তাঁকে নানারূপে আস্বাদন করি, আবার অরূপ রূপেও আস্বাদন করি।' এ একমাত্র ঠাকুরেরই বৈশিষ্ট্য, যা অন্যত্র দেখা যায় না। অন্য সাধকরা বড়জোর কোন একটি ভাবে বা ছাঁচে যদি নিজেকে ঢালতে পারেন, তাহলেই জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ঠাকুরের তা হ'লে চলে না। তিনি সমস্ত জগৎকে দেখাতে চেয়েছেন। যত ছাঁচ আছে, সবগুলি সত্য; কাজেই নিজেকে সব ছাঁচে ঢেলে দেখিয়ে দিচ্ছেন এভাবেও হয়, ওভাবেও হয়। আর এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরামকৃষ্ণত্ব।

কিন্তু এগুলি সকলের জন্য নয়। সাধারণ সাধকের দরকার ইষ্টনিষ্ঠা, তার ছোট্ট মন, সব ভাব তাতে ধরে না। কাজেই সে তার ছোট্ট মন দিয়ে যদি একটি ভাবে নিজেকে মগ্ন করতে পারে, তার জীবনের তাতেই পূর্ণ সার্থকতা। কিন্তু জগতের লোককে নিজের নিজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি এসেছেন, তাঁকে কেবল ঐটুকু করলে হবে না। তাঁর সর্বভাবের অভিজ্ঞতা চাই, সর্বভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ পরিচিত ক'রে তবে তো সকলকে সেই সেই পথে নিয়ে যেতে পারবেন। অবতার ব'লে যদি তাঁকে সর্বজ্ঞ বলি তাহলে যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন ভাবের সাধনা নিজে ক'রে, পরিচয় লাভ ক'রে, তবে জগৎকে তা দেখানো দরকার; তবে জগৎ

সেই সাধনা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে এবং সেই পথে এগোবে। তা না হ'লে ভগবান পরিপূর্ণ হয়েও আমাদের সাহায্য করতে পারছেন না, কারণ তিনি আমাদের নাগালের বাইরে। তিনি যদি দেহধারণ ক'রে আমাদের মধ্যে আসেন, আমাদেরই মতো সাধনা ক'রে সিদ্ধি লাভ ক'রে দেখিয়ে দেন যে, এইভাবে সিদ্ধি লাভ হয় ; তা হ'লে আমরা বুঝতে পারি, ওঁর যখন হয়েছে, আমাদেরও হ'তে পারে। ঠাকুর বলছেন—'তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, কমলাকান্তকে দেখা দিলি, আমাকে দিবি না কেন?'—এই নজির টানা। যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখা দিয়ে থাকেন, আমাদেরও তিনি দেখা দেবেন। এইজন্য অবতারকে সাধনা করতে হয়। অবতার সিদ্ধ হয়েও, পরিপূর্ণ হয়েও দেহধারণ ক'রে আসেন বলে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নানাভাব দেখিয়ে যেতে হয়। তিনি সহজাত জ্ঞান নিয়ে এলেও তাঁকে নতুন ক'রে অভিব্যক্ত ক'রে সকলের সামনে নজির দেখাতে হয়। এ জ্ঞানের সম্বন্ধে যেমন ভক্তির বিভিন্ন ভাব সম্পর্কেও সেইরকম। সর্বভাবে তিনি নিজেকে বিকাশ ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছেন—'এই দেখ, এই পথে এই রকম ক'রে যেতে হয়, তাতে এই এই বাধা, এই রকম লক্ষণ, এইভাবে সেখানে পৌঁছতে হয়, পৌঁছলে এইরকম অনুভব হয়।' প্রত্যেকটি ভাব এই রকম ক'রে সাধককে দেখাচ্ছেন।

ঠাকুর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—পাখী যখন বাচ্চাকে উড়তে শেখায়, সে নিজে এক ডাল থেকে আর এক ডালে উড়ে যায়। আবার উড়তে উড়তে আর এক ডালে বসে, বাচ্চাটিও সেইরকম টুক্‌টুক্ ক'রে শেখে। সে যদি সোজা আকাশে উড়ে যেত, তার বাচ্চাটা কোন দিনও উড়তে শিখত না। ঠিক এই রকম ক'রে অবতার নিজের জীবনে সাধনা ক'রে দেখিয়ে দেন একটি একটি ক'রে পা ফেলে কিভাবে এগোতে হয় এবং সেইভাবে দেখান বলে তিনি অবতার ; আমাদের তাঁকে

প্রয়োজন। এ ভাবে না ক'রে দেখালে আমাদের জীবনে অবতার হিসাবে তাঁর কোনও সার্থকতা থাকত না। তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছুই লাভ করতাম না, এইজন্য তাঁদের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে প্রত্যেকটি সাধনা ক'রে দেখিয়ে দিলেন, এর ভিতর ভাবের কোন উচ্চ-নীচ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট নেই। যে যে-ভাবের সাধক সে সেইপথ অনুসরণ ক'রে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কোন তারতম্য এর ভিতর আসে না।

শেষকালে ঠাকুর এখানে বলেছেন, "শিব-অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়। বিষ্ণু-অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়।" একই পরমেশ্বর একরূপে শিব, অন্যরূপে বিষ্ণু—এইভাবে লীলা করছেন। একই পরমেশ্বর তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ। তার ভিতর উচ্চ-নীচ কিছু নেই; আছে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, প্রকাশের তারতম্য অনুসারে নিজেদের গ'ড়ে নেবার জন্য দুটি ছাঁচ—একটি জ্ঞানের, অন্যটি ভক্তির; কিন্তু বস্তু সেই এক—পরমেশ্বর।

নয়

কথামৃত—১।১৩।৭

সন্ন্যাস : শাস্ত্রবিধি ও অধিকারবাদ

পরিচ্ছেদটির সূচনায় মাস্টারমশায় অল্প কথায় হাজরার সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক সুন্দরভাবে বললেন। ঠাকুর হাজরাকে বাড়ী গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে বলছিলেন। বলেছেন,—তোমার মা, স্ত্রী, সন্তানাদির প্রতি কর্তব্য করতে হবে। তোমার ছেলেপিলেকে কি পাড়ার লোক মানুষ করবে? হাজরা বাড়ী যেতে চান না; মহিমাচরণকে বলছেন যে, ঠাকুর তাঁকে জোর করে বাড়ী পাঠাতে চাইছেন, তাই মহিমা হাজরার হয়ে ঠাকুরের কাছে দরবার করছেন। ঠাকুর উত্তরে বলছেন, মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়? ঠাকুরের এ কথাটি আপাতবিরোধী। প্রশ্ন উঠবে, সাধুদের কি মা ছিলেন না? তাঁরা দুঃখ পাননি? এখানে ঠাকুরের কথা হ'ল—ঈশ্বরের সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। ভগবানের পথে কোন বাধাকে মানা চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর কোন আপস নেই, কারণ বৈরাগ্য সেখানে তীব্র। তা যদি না থাকে, তা হ'লে মা-বাপ, আত্মীয়-পরিজন, সমাজ-দেশ, এসবের ভাবনা-চিন্তা হিসাব-নিকাশ এসে পড়ে। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'লে, ঠাকুরের ভাষায় তাঁর জন্য পাগল হ'লে, তার কোন কর্তব্য থাকে না। তীব্র ব্যাকুলতা না আসা পর্যন্তই কর্তব্যের বন্ধন, শাস্ত্রের বন্ধন। ব্যাকুলতা এলে সে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে ভগবানের দিকে যায়। যখন কারো সংসার ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে, তখন অবশ্যই তাকে বিচার করতে হবে, সে ঝামেলার জন্য সংসার ত্যাগ করতে চাইছে, না ঈশ্বরের প্রতি ব্যাকুলতার জন্য? হাজরা প্রমুখ অনেকে সংসারের

ঝামেলা সইতে নারাজ। কিন্তু সংসার তার পাওনা ছাড়বে কেন? সুদ শুদ্ধ আদায় ক'রে নেবে।

ঠাকুর যে বললেন, মায়ের কথা মনে হ'ল ব'লে আর বৃন্দাবনে থাকতে পারলেন না, সেটি অন্য কথা। তিনি নজির দেখাবেন কিনা, তাই সব রকম নজিরই দেখাতে হবে। এখানে তিনি এক কথা বললেন, আবার অন্য জায়গায় বলছেন—ভগবানের জন্য যখন কেউ ব্যাকুল হয়, তখন তার আর কোন কর্তব্য থাকে না। গীতায় আছে ঃ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ (৩. ১৭.)

যিনি আত্মরতি, আত্মাতেই তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট, তিনি সব কর্তব্যের বন্ধন থেকে মুক্ত। সুতরাং তাঁর জন্য কোন কর্তব্যের বন্ধন শাস্ত্র রাখেননি, রাখলে সন্ন্যাস শাস্ত্রসম্মত হ'ত না। এ সম্পর্কে মীমাংসক আর জ্ঞানীদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ র'য়ে গিয়েছে। মীমাংসকদের মতে সন্ন্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ। সেখানে আছে—যতদিন বেঁচে থাকবে, অগ্নিহোত্র করবে। তবে তঁাদের মতে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, কর্মক্ষমতা যাদের নেই, তাদের রেহাই দেওয়া যেতে পারে। তাদের জন্য বিধান ক'রে লাভ কি? যে করতে পারে, তাকে বলা যায় 'কর', যে পারে না তাকে 'কর' বলার সার্থকতা নেই। সুতরাং যতদিন কর্মক্ষমতা আছে, ততদিন শাস্ত্রীয় কর্ম ক'রে যেতে হবে, সন্ন্যাস নেওয়া চলবে না। আর যার জন্যে সন্ন্যাসের বিধান আছে, বুঝতে হবে—তার কর্মের সামর্থ্য নেই।

ঠিক তার বিপরীতক্রমে জ্ঞানী বলবেন, কামনা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কর্মের বিধান। বিবাহের পর সন্তান হ'লে সেই সন্তান পিতার অসম্পূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করবে, এ-সব কথা যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণের জন্য। যিনি বাসনামুক্ত হয়েছেন বা হবার চেষ্টা করছেন, তিনি বলবেন, এ-সব ক'রে আমার কি লাভ? প্রজা বা সন্তান ইহলোকের জন্য;

যাঁর কাছে ইহলোক পরলোক কাম্য নয়, তাঁর সন্তান বা যাগযজ্ঞ নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের জন্য সন্ন্যাসের বিধান। যতক্ষণ বাসনা আছে ততক্ষণ কর্ম করতে হবে। যখনই বিষয়ে বৈরাগ্য হবে, তখনই তা ত্যাগ করবে। তখন কে আছে, কে নেই, কার মনে দুঃখ হবে, কে আঘাত পাবে—এত খতিয়ে দেখে হিসাব করতে হবে না। ঠাকুর বলছেন, আইনে আছে নাকি, পাগল হ'লে আইন তার প্রতি প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং ভগবানের জন্য পাগল হ'লে তার কর্তব্য থাকে না। 'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'। হাজরার সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তীব্র বৈরাগ্য তার ছিল না। হিসাববুদ্ধি ছিল, তাই ঠাকুর বলছেন, তার কর্তব্য আছে। কর্তব্য এড়িয়ে পলায়নীবৃত্তি (escapism) চলবে না। যত শারীরিক বা অন্য কষ্ট হ'ক, কর্তব্য খুঁটিয়ে ক'রে যেতে হবে। যাঁর জীবন বৈরাগ্যময়, যিনি বাসনা ত্যাগ করবার চেষ্টা করছেন বা নির্বাসনা হয়েছেন তাঁর জন্য বিধান যে তিনি সংসার ত্যাগ করবেন। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে বিধান দিয়েছেন—'ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্, গৃহাদ্বা বনাদ্বা।······যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' (জাবাল উপ.)—ব্রহ্মচর্য পরিসমাপ্তির পর গৃহী হবে, গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থের পর 'সন্ন্যাস' করবে। আর তা না হ'লে ব্রহ্মচর্য থেকেই অথবা গৃহ থেকে বা বন থেকে 'সন্ন্যাস' করবে। যেদিন বৈরাগ্য হবে, সেইদিনই সন্ন্যাস নেবে। তবে যার মনে সন্ন্যাস নেবার মতো প্রস্তুতি নেই, তীব্র বৈরাগ্য আসেনি, তার পক্ষে তৈরী হয়ে যেতে যেতে ক্রমশঃ সন্ন্যাসের পথে এগোবে।

পিতামাতার কর্তব্য ও শাস্ত্রদৃষ্টান্ত

ব্রহ্মচর্য সকল আশ্রমের প্রস্তুতি ব'লে গোড়ায় সকলের জন্য ব্রহ্মচর্যের বিধান। ব্রহ্মচর্যের পর বৈরাগ্যের তীব্রতার উপর ভিত্তি ক'রে সে

সিদ্ধান্ত করবে সংসারে থাকবে, না সংসার ত্যাগ ক'রে যাবে? বৈরাগ্য তীব্র না হ'লে তাকে ক্রমমুক্তির পথ দিয়ে যেতে হবে। জিনিসটা এইরকম—ব্রহ্মচর্যের পর মনের একটা প্রস্তুতি হ'ল, সংযমের অভ্যাসে বুদ্ধি মার্জিত হয়ে বিচার শক্তির বিকাশ হ'ল। তারপর সে নিজের জীবন পছন্দ ক'রে নিক। বাবা মা বা অপর কেউ তার হয়ে পছন্দ ক'রে দেবে না। বাপ-মার কর্তব্য সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে শেষ হয়। বাপ-মা ভাবেন ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, আমাদের প্রতি তার কি কোন কর্তব্য নেই? অনন্ত কর্তব্য থাকে ঠিকই। কিন্তু যদি সে মহৎ লক্ষ্য স্থির ক'রে এবং সন্ন্যাসের পথে যেতে চায় শাস্ত্র তাকে বাধা না দিয়ে উৎসাহ দেন। বাপ-মা বাধা দেন—তাঁদের কি হবে এই ভেবে, কিন্তু তাঁরা এটুকু ভাবেন না যে বাধা দিলে সন্তানের যথার্থ কল্যাণ কামনা করা হ'ল না, যা হ'ল তা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই স্বার্থকে যেন সোনার পাতে মুড়ে দিয়ে বলা হয়, আমাদের প্রতি তার কি কোন কর্তব্য নেই? হয়তো তার কর্তব্য আছে, কিন্তু সন্তান পালন করা কি অর্থ বিনিয়োগ (investment) করার মতো যে, প্রতিদানে সন্তান বাপ-মাকে পালন করবে? তা হ'লে পিতৃত্ব মাতৃত্বের মহত্ত্ব থাকে কোথায়? এ তো ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। এত মূলধন দিয়ে দোকান খুললাম, এত লাভ হবে বলে। এটা ব্যবসা, এর মধ্যে মহত্ত্বের কিছু নেই। বাপ-মায়ের কর্তব্য আরো উচ্চতর বস্তু। শিশু জন্মাবার পর বড় হয়ে সে বাবা-মার সেবা করবে, এই ভেবে বাপ-মা তাকে পালন করেন না। শিশু অসহায় এবং তার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁরা তাকে পালন করেন, আর তাতেই আনন্দ পান। কিন্তু পরে সন্তান শিক্ষা লাভ ক'রে বড় হবার পর সে সুদ শুদ্ধ ফেরৎ দিক। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এটা সঙ্গত মনে হবে, কিন্তু সে যদি উচ্চতর লক্ষ্য সামনে রেখে এগোয়, তবে তাকে উৎসাহ দেবে না? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো যায়, দেশ

রক্ষার জন্য যে সৈন্য দরকার হয়, সে সৈন্য অপরের ছেলে হ'ক, নিজের নয়। বিজয়ী সৈন্যদের বাহবা দিই, কিন্তু নিজের ছেলেকে সৈন্যদলে দিতে পারি না। তেমনি সন্ন্যাসীকে দেখে বলি, কি উচ্চ জীবন; পরার্থে উৎসর্গীকৃত, সুন্দর আদর্শ। কিন্তু অপরে এই আদর্শ অনুসরণ করুক, নিজের ছেলে নয়। এর ভিতরে কপটতা আছে, ঠাকুর যাকে পাটোয়ারী বুদ্ধি বলতেন।

স্বামীজী মদালসার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মদালসা সন্তানের জন্ম থেকে দোলায় দোল দিতে দিতে বলতেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'—তুমিই সেই নিরঞ্জন নিষ্পাপ শুদ্ধ আত্মা। ছোট ছেলেটি আশৈশব মায়ের কাছ থেকে এ-কথা শুনে বুদ্ধির বিকাশ হ'লে বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে চলে গেল। এমনি ক'রে পর পর সব সন্তানই বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ ক'রল। মার কি এতে ত্রুটি হ'ল? এমন কোন বাবা-মা নেই, যাঁরা সন্তানের সুখ চান না, এখন তাঁদের মতো হয়েই যে সুখী হ'তে হবে, তা নয়। যেভাবে সন্তান সুখী হবে, ধৈর্য ধরে তাকে সেইভাবে সুখী করতে এবং তার সে সুখে সহানুভূতি সম্পন্ন হ'তে আমরা পারি কি? সন্তানকে ছাড়তে হলে বাবা মার পক্ষে দুঃখ পাওয়া স্বাভাবিক। তাঁরা তাঁদের মমত্ববুদ্ধি দিয়ে জীবনকে যেভাবে উপভোগ্য বলে ভাবেন তাঁদের সন্তানও সেইভাবে গ'ড়ে উঠুক, জীবন উপভোগ করুক, সুখী হ'ক—এইটাই তাঁরা চান। এদিক দিয়ে তাঁদের দোষ নেই। সে বৈরাগ্য তাঁদের মনে নেই বলে তাঁরা সন্তানের বৈরাগ্যকে উৎসাহিত করতে পারেন না। ঠাকুর সব রকমই করেছেন। বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দ) টেনে নিয়ে বলছেন আর একটিকে টানব নাকি? তারপর বলছেন - একটিকে টেনেছি, একটি থাক। আমাদের পুণ্য পবিত্র ভারতে এ-রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, সন্তান ত্যাগময় জীবন যাপন করেছে বলে বাবা-মা সানন্দে আশীর্বাদ করছেন।

এবার সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কেউ যদি ঝামেলার জন্য সংসার ত্যাগ করে, তাহলে সাধু তো হবেই না, সমাজে বাসেরও অযোগ্য হবে। মানুষ ভুঁইফোড় নয়, তাকে আত্মীয় পরিজন সমাজ ও দেশের পরিধির মধ্যেই বাস করতে হয়, যাদের প্রতি অতি স্বাভাবিক কারণেই তার একটা কর্তব্য থাকে। কিন্তু যখন তার মন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় তখন এসব কোন কর্তব্যই তার পায়ে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু যে বৈরাগ্য কেবলমাত্র সাংসারিক অশান্তির হাত থেকে এড়ানোর জন্য তা তো কাপুরুষতারই নামান্তর মাত্র। শাস্ত্রে তার সমর্থন নেই। এমনকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনের আত্মীয় স্বজনের প্রতি তথাকথিত দয়াকে ভগবান নিন্দা ক'রে বলছেন, এ কাপুরুষতা, এ দয়া নয়। আবার সেই ভগবানই বলছেন, যিনি সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত তাঁর কোন কর্তব্য নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিচারদৃষ্টি ও পথনির্দেশ

নাগমশায় সংসার ত্যাগ করতে চাইলে ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি সংসারে থাকবে, তোমাকে দেখে লোকে শিখবে—সংসারে কেমনভাবে থাকতে হয়"। সমাজে উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য কেবল সংসারে থাকা। তাঁর কোন কর্তব্য নেই। পাঁচ বছরের বালক নারদ মায়ের মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করলে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি সর্বত্র ভক্তি প্রচার ক'রে বেড়াও।

জগতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটি ধারা আছে। দুটিই শাস্ত্রসম্মত ও অবস্থা বিশেষে প্রযোজ্য। এখন যদি সকলের সংসার করা কর্তব্য, তবে সেটা নেহাতই হাস্যকর শোনাবে। বিধাতা যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চালিয়ে নেবার দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন। দায়িত্ব কেউ আমাদের দেয়নি, আমরা নিজেরাই নিজেদের কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে মনে

করছি, করতে হবে এবং ক'রে যাচ্ছি। যতক্ষণ মনে বাসনা রয়েছে, ততক্ষণ এ কর্তব্যের বোঝা আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছি; বাসনা চলে গেলে এই সব কর্তব্য নিঃশেষ হয়ে যাবে এক নিমেষে।

এই দৃষ্টিতে দেখে হাজরার প্রতি ঠাকুরের উপদেশ বুঝতে হবে। হাজরার চারিত্রিক ঐশ্বর্য, সে আধ্যাত্মিক জীবনের কোন্ স্তরে আছে, এ-সব দেখে ঠাকুর তার জন্য এ বিধান দিয়েছেন। আবার নরেন্দ্রাদি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের এর বিপরীত উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ভগবানের জন্য সব ত্যাগ করতে হবে। এক একটি ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, ভগবান সবচেয়ে বড়, তারপর অন্য সব। বাপ-মার চেয়ে ঈশ্বর বড়। আবার এখানে হাজরাকে বলেছেন, বাপ-মাকে কষ্ট দিলে কি ধর্ম হয়? ঠাকুর বিচক্ষণ বৈদ্য, অধিকারী-ভেদে পথ্য নির্দেশ করছেন। সকলের জন্য এক পথ্য নয়। সকলে সন্ন্যাসী হবে, এ বলা যেমন অন্যায়, আবার সবাই গৃহী হবে, সে দাবী করাও ঠিক তেমনি অন্যায়। বাপ-মায়েরা প্রায়ই নিজেদের মনোমত ক'রে সন্তানকে গড়ে তুলতে চান, তা ঠিক নয়। সন্তানের একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকে, সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশের দ্বারা সে পূর্ণতা লাভ করুক—এইভাবে তাকে সাহায্য করা বাপ-মা-শিক্ষকের কর্তব্য। নিজেদের ছাঁচে তাকে গড়ার চেষ্টা করা ঠিক নয়। সমাজের প্রয়োজনে তাকে বড় হ'তে হবে। সে প্রয়োজন যুদ্ধ ক'রে দেশরক্ষাই হ'ক বা শারীরিক শ্রমের দ্বারা দেশসেবাই হ'ক —নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে। অথবা পারলে ত্যাগের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন ক'রে সন্তানদের এগিয়ে দিলেও বাপ-মায়ের কর্তব্য করা হবে। বাপ-মার দিক থেকে কি কর্তব্য, আবার সন্তানের দিক থেকে কি কর্তব্য—ঠাকুর এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি দেখেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন, যা এই কথামৃতের ভিতরেই বহু জায়গায় দেখা যায়।

দশ

কথামৃত—১।১৩।৮

দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ পদচারণা করছেন। "সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজমন্ত্র জপিয়া নাম গান করিতেছেন।·· ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে। ···আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব – যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে-- কেহ নিরানন্দ হইও না। আমাদের মা আছেন। আনন্দ কর।·· কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমানন্দে বসিয়া আছেন।" মাস্টারমশায়ের সন্ধ্যাকালীন বর্ণনাটি ভারী সুন্দর ছবির মতো ফুটে উঠল।

বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি

ঠাকুরের ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায় এসেছেন। তিনি জপ তপ পুরশ্চরণ করতেন। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, "তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ এই সব কর্ম ক'রছ, তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই-সব কর্ম করিয়ে লন। ফলকামনা না ক'রে, এই-সব কর্ম ক'রে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।"

ঠাকুরের এই উক্তিটি লক্ষণীয়। প্রথমতঃ বললেন, তিনি করান তাই করি—এ বুদ্ধি রাখলে অহং বোধ আসে না; দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম করলে ঈশ্বর লাভ হয়। 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'—বর্ণাশ্রম-বিহিত, শাস্ত্রে কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট নিজের কর্মের দ্বারা ভগবানের আরাধনা ক'রে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শুভফল স্বর্গাদি লাভ ক'রব—এই-সব কামনা না থাকলে ভগবান লাভ হয়। বৈধীভক্তি ভাল, তা ভগবানের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু কামনাপূর্বক বৈধী-

ভক্তি করলে কেবল কাম্যবস্তুটির লাভই এর ফল, আর কামনাশূন্যভাবে তাঁর আরাধনা করলে তাঁকে পাওয়া যাবে। ঈশান মুখোপাধ্যায় পুরশ্চরণ করতেন সকামভাবে। এর দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণ হবে না। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—(গীতা-৬.২২) —যা লাভ করলে তার চেয়ে বেশি লাভ করবার মতো আর কিছু থাকে বলে মনে হয় না ; সেই লাভ ভগবান লাভ। তাঁকে পেয়ে সব পাওয়া হ'য়ে যায়। মানুষ চিরতৃপ্ত হয়, মত্ত হয়, জড়প্রায় হ'য়ে চেষ্টারহিত, আত্মারাম হ'য়ে যায়, 'মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি'—নিজের হৃদয়ে সব আনন্দের উৎস খুঁজে পায়। এই অবস্থাটি ঠিক সিদ্ধের লক্ষণ।

তাঁকে অর্চনা ক'রে মানুষ যে সিদ্ধিলাভ করে, তা লৌকিক উন্নতির অভ্যুদয় নয়। ভগবান বা নিঃশ্রেয়স লাভ বা সমস্ত জীবনের সমস্যার চিরকালীন সমাধান হ'ল এই সিদ্ধি। ঠাকুর সেইজন্য ঈশানকে নিষ্কাম ও অভিমানবর্জিত হ'য়ে কর্ম করার নির্দেশ দিলেন: "শাস্ত্রে অনেক কর্ম ক'রতে বলে গেছে, তাই করছি ; এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে।"

এর পর রাগভক্তির কথা বলছেন, "সেটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধীকর্মের প্রয়োজন হয় না।" রামপ্রসাদের গানে আছে, 'কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসির লোকাচার'—যে তাঁতে মন লিপ্ত করেছে, তার বাহ্যপূজা লোকাচার—এ-সবের আর প্রয়োজন হবে না। বৈধীভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে সংকোচের, সম্ভ্রমের ব্যবধান থাকে, কিন্তু অনুরাগ এলে ভগবান ভক্তের আপন হ'য়ে যান। ভক্তিশাস্ত্রে এই রাগাত্মিকা ভক্তির বর্ণনা আছে—ভাগবতে বর্ণিত গোপীপ্রেমই যার পরাকাষ্ঠা।

শ্রীভগবানের বিরহে গোপীগণ কাতর। তাঁদের সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি উদ্ধবকে পাঠালেন। তিনি এসে গোপীদের বললেন, ভগবান অন্তর্যামী; তোমাদের অন্তরেই তিনি আছেন, ধ্যান করলেই তাঁকে দেখতে পাবে। উত্তরে গোপীরা বললেন: যে মন দিয়ে ধ্যান ক'রব, সে মনই তো তাঁকে সমর্পণ করেছি, ধ্যান ক'রব কি দিয়ে? উদ্ধব জ্ঞানী, ভক্তের এ উন্মাদনা তাঁর জানা ছিল না; এটুকু শিক্ষা দেবার জন্য ভগবান তাঁকে গোপীদের কাছে পাঠালেন। ঠাকুর সেইরকম ঈশানকে ইঙ্গিত ক'রে বলছেন, বৈধীভক্তি ভাল ঠিকই, কিন্তু এর থেকে আরো বড় জিনিস আছে। এই বৈধীভক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট, কিন্তু অন্তরের আকর্ষণের ভক্তি এ নয়। যখন ভগবানকে অতি আপনার বোধ হবে—তখন কোন বিধি-বাঁধন নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে তাঁর কাছে যেতে হবে না।

মীরার সপ্রেম সেবা

এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। বৃন্দাবনে এক মন্দিরে মীরাবাঈ ভোগ রান্না করতেন। মধুর স্বরে ভজন করতে করতে তিনি রান্না করেন। একদিন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দেখেন মীরা পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন না ক'রে, স্নান না করেই রন্ধন করছেন। এইরকম অশুচি অবস্থায় ভোগ রান্না করার জন্য পুরোহিত মীরাকে ভৎর্সনা করলেন। ভগবান এ অন্ন যে গ্রহণ করছেন না, তিনি তাও জানিয়ে দিলেন। পরদিন মীরা শুচিস্নাত হ'য়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে ভোগ রান্না করছেন। শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে সর্বদা সন্ত্রস্ত, পাছে কিছু দোষ-ত্রুটি হয়ে যায়। তিনদিন পরে ভগবান প্রধান পুরোহিতকে স্বপ্নে জানালেন, তাঁর তিনদিন খাওয়া হয়নি। পুরোহিত ভাবলেন মীরা নিশ্চয়ই শাস্ত্রীয় বিধি মেনে চলেননি, শুদ্ধ হননি। ভগবান জানালেন, সে

সর্বদা সন্ত্রস্ত, পাছে কিছু অশুদ্ধ অপবিত্র হ'য়ে যায়। তার প্রেম-মধুর ভাব আর পাচ্ছি না। সে-জন্য এ ভোগ আমার রুচিকর লাগছে না। তখন পুরোহিত মীরার কাছে ক্ষমা চেয়ে আগের মতো প্রেমপূর্ণভাবে ভোগ রান্না করার অনুরোধ জানালেন।

এ কাহিনীটির তাৎপর্য এই যে, যখন অন্তরের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা হয়, তখন আর কোন বিধি থাকে না। শ্রীভগবান আবির্ভূত হ'লে কি ব'লব, দাঁড়াও, আগে আসনশুদ্ধি করি? ঠাকুর জগন্মাতার পুজোর সময় কখনো মায়ের চরণে ফুল দিচ্ছেন, আবার কখনো নিজের মাথায় দিচ্ছেন। বলছেন, 'মা, দাঁড়া, এখন খাসনি, আগে মন্তরটা বলি।' ঠাকুরের কথাটি বুঝতে হবে। অভিমানশূন্য ও নিষ্কাম হ'য়ে তাঁর পূজা করতে পারলে ভাল, কিন্তু ভালবাসা দিয়ে সেবা করা আরো ভাল। মন্ত্র সেখানে গৌণ, নিষ্প্রয়োজন। তাঁকে সেবা করার নির্মল আনন্দেই তাঁকে আস্বাদন করা হয়। বৈধীভক্তিতে এ আস্বাদন হয় না। তবে প্রথম প্রবর্তকের পক্ষে বৈধীভক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে; এর ফলে ধীরে ধীরে তার ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তাই বৈধীভক্তি উপায়-মাত্র, উদ্দেশ্য রাগাত্মিকা ভক্তি। বৈধীভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রেই ঠাকুর ঈশানকে তার ত্রুটিটা বুঝিয়ে দিলেন।

আকবর ও ফকির

ভগবানের কাছে স্বাভাবিক কামনা অন্তরের সঙ্গে জানালে তিনি শোনেন, কিন্তু ঠাকুর বলছেন, 'রাজার কাছে যেয়ে কি লাউ-কুমড়ো চাইবে?' যিনি অতুল ঐশ্বর্য দান করতে পারেন, তাঁর কাছে সামান্য লাউ-কুমড়ো চাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ভগবান বরদ-রাট্— বরদাতাদের মধ্যে রাজা—নিজেকে পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। এমন

দাতা আর কে আছেন, যিনি নিজেকে পর্যন্ত বিলিয়ে দেন? ঠাকুর বলছেন, বাবুর সঙ্গে ভাব থাকলে ছোটখাটো জিনিস চেয়ে ভৃত্যদের কাছে অপমানিত হ'তে হবে না। সুতরাং মালিকের সঙ্গে ভাব করাই ভাল। ঠাকুর এই ব্যাবহারিক দৃষ্টি দ্বারা বিচার ক'রে দেখছেন। একটি গল্পে আছে, সম্রাট আকবরের নমাজ পড়ার সময় এক ফকির ভিক্ষা নিতে আসেন। নমাজ শেষ হবার পর তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আকবর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি চলে যাচ্ছেন? ফকির উত্তরে জানালেন, তিনি সম্রাটের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন, কিন্তু দেখলেন সম্রাট আল্লার কাছে নানা জিনিস ভিক্ষা চাইছেন। তাই তিনি ভিখারীর কাছ থেকে ভিক্ষা না চেয়ে চলে যাচ্ছেন; তিনিও আল্লার কাছেই চাইবেন।

নিষ্কাম পূজা ও কর্ম

আমরা যে সব দেবতার কাছে নানা বস্তু কামনা করি, তাঁরা দেবতা ব'লে আমাদের থেকে শক্তিশালী ঠিকই, কিন্তু পরমেশ্বরের কাছে তাঁরাও প্রার্থী। তাহলে এত সব দেবতা কি জন্য? আমরা প্রত্যেক দেবতাকে আমাদের বুদ্ধি-অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যের সহায়করূপে অথবা স্বয়ং পরমেশ্বররূপে দেখতে পারি। দেবতা একই—পার্থক্য শুধু আমাদের দৃষ্টিতে। কালীপূজার সময় চৌষট্টি যোগিনীর পূজা সাঙ্গ ক'রে মূল দেবতার পূজা করতে হয়। বৈধীভক্তিতে এইটি হয়। যাগযজ্ঞ করতে গেলে অসংখ্য দেবতাকে নিখুঁতভাবে পূজা করতে হয়, না হ'লে ফললাভ হবে না। একটু অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য কত বিপত্তির সৃষ্টি হয়। একবার ইন্দ্র-নিধনের জন্য অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে বলার উদ্দেশ্য ছিল, ইন্দ্র-শত্রু অর্থাৎ ইন্দ্ররূপ শত্রু বিনাশ হ'ক, কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণবশতঃ অর্থ হ'ল—ইন্দ্র শত্রু যার অর্থাৎ বৃত্রাসুর বিনাশ হ'ক। উচ্চারণের ভুলে শব্দটির অর্থ ভিন্ন হ'য়ে গেল।

কিন্তু যে নিষ্কামভাবে পূজা করে, তার কোন ত্রুটি ভগবান ধরেন না। সে নির্ভয়। ভগবান কি আমাদের অমঙ্গল করার জন্য বসে আছেন? ভগবান কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। গীতায় (৫. ১৫) আছে:

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

তবু অজ্ঞান দ্বারা মোহগ্রস্ত মানুষ তার সংশয়ান্বিত মন নিয়ে কল্পনা করে যে, ভগবান আমাদের তিরস্কৃত বা পুরস্কৃত করবেন। ভগবানকে ভয় না ক'রে ভালবাসতে হবে। ভাগবতে আছে, 'ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্'—ভক্তির দ্বারা উৎপন্ন ভক্তিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। নিষ্কামভাবের অভিমানশূন্য বৈধীভক্তি থেকে উৎপন্ন হয় রাগভক্তি, ভগবানের প্রতি অনুরাগ—যার বাহ্য প্রকাশ অশ্রুপুলকাদি।

কর্ম করতে গিয়ে কিছু মন্দ কাজও এসে যায়, সুতরাং তার ভয়ঙ্কর পরিণামও মেনে নিতে হবে। এটি স্বীকৃত. ধোঁয়া যেমন অগ্নিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, মানুষের সব কর্মই তেমনি দোষের দ্বারা আচ্ছন্ন—'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' সুতরাং এই দোষ দূর করার জন্য সকাম কর্ম না ক'রে নিষ্কাম কর্ম করাই কল্যাণকর। তাতে অন্তর শুদ্ধ হবে এবং শুদ্ধ অন্তরে ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে। এখানে দোকানদারী মনোভাব নেই—এত জিনিস দিলাম, তার এই মূল্য দাও। মানুষ সকামভাবে পূজা ক'রে সর্বশেষে কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে। পূজাপদ্ধতি এই প্রণালী শেখায়। ভগবানে ফল অর্পণ ক'রে এই লাভ হয় যে, ভগবান সেই ফল অনন্তগুণে ফিরিয়ে দেন। কৃষক বীজ বপনের সময় মুঠো মুঠো ধান জমিতে ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু মনে আশা রাখে যে, এর অনন্তগুণ সে ফিরে পাবে। ঠিক সেই রকম মানুষ মুখে বলছে, 'তোমাকে দিলাম'; মনে বলছে, 'তুমি অনন্তগুণে ফিরিয়ে দাও।'

এগার

কথামৃত—১।১৩।৯

জীবের স্বতন্ত্রতা ও পরতন্ত্রতা

অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : মানুষ স্বতন্ত্রভাবে কাজ-কর্ম করে, না ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ; তার স্বাধীনতা আছে, না কি সে একান্ত পরতন্ত্র। এই পরিচ্ছেদে ঠাকুর এই প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত করেছেন ; ফলে অদৃষ্টবাদ (Predestination), স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will), স্বতন্ত্রতা (Liberty) আর প্রয়োজনীয়তা (Necessity)র বিবাদ মিটে যাচ্ছে।

ঠাকুর সেই ধার্মিক তাঁতীর গল্প বলছেন। মাস্টারমশায় বলছেন, ভগবৎ-দর্শন ব্যতীত এই 'রামের ইচ্ছা'র অনুভূতি হয় না, বোঝা যায় না যে, তিনিই সব করাচ্ছেন। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত হ'য়ে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো তাদের নাচাচ্ছেন। লোকে বলে, 'আমি করি', কিন্তু আসলে তিনিই করাচ্ছেন। 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।' দিব্যদৃষ্টি থাকলে আমরা দেখতাম, আমরা যন্ত্রমাত্র—অথচ সেই যন্ত্রবুদ্ধি নেই ব'লে কর্তৃত্ব বোধ আসছে। তিনি নানাভাবে, নানা-রূপে কর্ম করাচ্ছেন—কাউকে দিয়ে শুভকর্ম, আবার কাউকে দিয়ে অশুভ কর্ম। এতে কিন্তু তাঁর পক্ষপাত দোষ হয় না। কারণ পক্ষপাত কার উপর করবেন ? সবই তো তিনি ! যাঁকে কৃপা করছেন বা যাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন, সবই যে তিনি। ফড়িং-এর পিছনে একটা কাঠি গোঁজা দেখে ঠাকুর বলছেন, 'রাম, তোমার নিজের দুর্গতি তুমি নিজেই করেছ।'

বেদে শিবের নানাভাবে স্তুতি করার পর বলা হচ্ছে : তুমি চোর জুয়াচোর ইত্যাদি। ভাব হচ্ছে, ভাল-মন্দ শুভ-অশুভ—সবই তিনি।

আমাদের শুভাশুভ ভেদ আছে বলেই শুধু শুভতে তাঁকে দেখি। আমরা অশুভকে সরাবার জন্য শুভতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে চাই. সেইজন্যই শুভদৃষ্টি দরকার। ভগবানের কল্যাণ-গুণে মনকে নিবিষ্ট রাখা প্রয়োজন, না হ'লে আমাদের মনে অশুভভাব বেড়ে যাবে। এই শুভ দ্বারা অশুভকে দূর করাই সাধন এবং ভেদদৃষ্টি না থাকলে কি এ সাধন সম্ভব? ভেদদৃষ্টি কি রকম? তিনি ভিন্ন, আমি ভিন্ন, আমি জগতের ক্ষুদ্র অংশ। এই জগতে আছি, সুতরাং এই ভেদদৃষ্টির ফলে জগতের ভাল-মন্দের বিচার আমার আছে। তাই অশুভ যাতে আমাকে স্পর্শ না করতে পারে, তার চেষ্টা করছি সর্বদা। জগতে সর্বত্র তাঁর দর্শন হ'লে আর ভেদদৃষ্টি থাকে না। যখন সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে তিনি রয়েছেন, তখন কাকে শুভ আর কাকে অশুভ ব'লব? যখন সব রামের ইচ্ছা তখন আমার বা যদু-মধু এ-সবের ইচ্ছার দাম কি?

তা হ'লে যে বলছেন, মানুষ স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র—এ সমস্যা কি মিটে গেল? বাস্তবিক মানুষ যখন নিজেকে স্বতন্ত্র দেখছে—'আমি অমুক' ইত্যাদি, তখন এ-সব তার ব্যক্তিত্ববুদ্ধি থেকে আসছে। ব্যক্তিত্ববুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণই স্বাধীনতা। তারপর যদি কখনো সর্বত্র তাঁকে দেখতে শিখি, তখন 'আমি'কে কোথাও পাব না। ব্যক্তিটিও নেই. স্বাতন্ত্র্যও নেই সেখানে। সুতরাং ব্যক্তিমাত্রই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হ'য়ে আছে। 'রামের ইচ্ছা' গল্পটির ভিতর দিয়ে এইটি এখানে বুঝবার।

জীবের গতি ও লক্ষ্য

এরপর শ্রীম বলছেন, "অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন?" ঠাকুরের উত্তর এই প্রসঙ্গে, "তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ. সাপ করেছেন. গাছের ভিতর যেমন বিষগাছ করেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর-ডাকাতও করেছেন।" জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন।

"কেন করেছেন, তা কে বলবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে?" কেন-র সন্ধানে যখন আমরা যাই, তখন তর্কের অতীত বিষয়বস্তুকে তর্কের দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করি, যা সম্ভব নয়। তাই বলছেন, "ঈশ্বরকে না জানলে, 'রামের ইচ্ছা', এটি ষোল-আনা বোধই হবে না।" পূর্ণবিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত পাপ-পুণ্যের বোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তৃত্ববোধ থাকবেই থাকবে।

মাস্টারমশায় ঠাকুরের ভক্তির কথা ভাবছেন। ঠাকুর কেশব সেনকে কত ভালবাসেন। সে ভগবানের ভক্ত। তার জাতি-কুল না দেখে কেবল দেখছেন ভক্তি। মানুষকে বিচারের জন্য এইটি কষ্টিপাথর "ভক্তি-সূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক হয়।" যাঁর মধ্যে এই ভক্তিভাব দেখা যায়, ঠাকুর তাঁকেই আপনার মনে করেন। ভক্ত হলেই তাঁর আত্মীয়। সব নদীই ভিন্ন পথে এসে এক সমুদ্রে মিশেছে। সকলেরই ঐ একটি গন্তব্য—সমুদ্র। তিনি সমুদ্রের মতো অসীম, অনন্ত। আমরা এক-একটি ছোট ছোট জলধারা, বিভিন্ন পথ দিয়ে সেই এক সিন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছি। সমুদ্র আমাদের পরম গতি, চলার চরম নিবৃত্তি। বাহ্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের সকলের ভিতর সেই এক পরমতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছেন এক-একটি ক্ষুদ্র ধারা রূপে, এক-একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মির মতো। বিশাল আলোর কেন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে সকলে চলেছি নানা ভাবে—নানা পথ দিয়ে। যেতে যেতে এই ব্যক্তিত্বের গণ্ডি লয় পাবে। শুদ্ধ জলবিন্দু জলরাশিতে পড়লে সকলেই সেই জলরাশির সঙ্গে এক হয়ে যায়। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যান। বিন্দুটি রঙীন হ'লে, জলরাশিতে পড়লেও তার একটু একটু রঙীনভাব থাকে, তাই বিন্দুটি শুদ্ধ হওয়া দরকার। আমরাও ব্রহ্মসিন্ধুতে পতিত হ'লে বিন্দু থাকব না, সিন্ধুতে পরিণত হব। সেইজন্য শুদ্ধ হ'তে হবে আমাদের। অশুদ্ধিই আমাদের পরমেশ্বর থেকে পৃথক্ ক'রে রাখে। ব্যক্তিত্বটি

অশুদ্ধি মাত্র। খণ্ড ব্যক্তিত্বের পরিসমাপ্তি—জীবের জীব-ভাবের অবসান হবে পূর্ণস্বরূপের অনুভূতি হ'লে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সে এখনো সমুদ্রই আছে ; কারণ সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু নিজের চারিদিকে বেড়া দিয়ে জীব নিজেকে খণ্ড ও ক্ষুদ্র মনে করছে। এইটি কাল্পনিক, ভ্রমবশতঃ মিথ্যাজ্ঞানের বশীভূত হ'য়ে বেড়া রচনা করা হয়েছে। ভক্ত ভগবানকে সম্পূর্ণ শুদ্ধরূপে কল্পনা বা উপাসনা করে। ভগবান চিৎস্বরূপ, ভক্তও স্বরূপতঃ তাই, তবু প্রথমে সে নিজেকে খণ্ডিত, ক্ষুদ্র আর উপাস্যকে অখণ্ড চৈতন্যরূপে দেখছে। ক্রমশঃ যখন তার শুদ্ধি আসে, তখন দেখে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি উপাস্য, তিনিই এতদিন উপাসকরূপে ছিলেন। উপাস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার উপাসনার পরিসমাপ্তি। সুতরাং জ্ঞানী বা ভক্ত রুচি অনুসারে সামান্য পার্থক্য রাখলেও সে পার্থক্য স্বরূপতঃ নেই।

জগৎ স্বপ্নবৎ কিনা

শ্রীম আর একটি কথা বলছেন। "ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন, 'তা হ'লে ওজনে কম পড়ে'।" 'জগৎ স্বপ্নবৎ' কথাটি কি জগতের মধ্যে নয় ? যদি জগতের মধ্যে হয়, তা হ'লে কথাটিও স্বপ্নবৎ। 'জগৎ মিথ্যা' কথাটি কি সত্য ? সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ—এটি একটি সিদ্ধান্ত। বক্তাও কি স্বপ্নবৎ ? তার বাক্যও স্বপ্নবৎ ? তা হ'লে ব্রহ্মের অস্তিত্ব কোথায় থাকছে ? যিনি ব্রহ্মের কথা বলছেন, তিনি জগতের একটি অঙ্গ মাত্র—তা হ'লে তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা আছে। 'মিথ্যার মিথ্যাত্ব' বলা হচ্ছে। 'মিথ্যা' কথাটি মিথ্যা। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে জগৎ-বোধ—আমি-বোধ যতক্ষণ, ততক্ষণ জগৎ স্বপ্নবৎ বলার উপায় নেই। এ যেন অন্তভূমি থেকে সিদ্ধান্ত ক'রে বলা হয়— 'জগৎ স্বপ্নবৎ'। বাস্তবিক যারা এই জগতে বাস করছে—ব্যবহার, শাস্ত্র-

চর্চা, জ্ঞানচর্চা, পূজা, উপাসনা—সব করছে জগতেরই মধ্যে থেকে. সেই-জগৎ আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। অবশ্য তত্ত্ব-দৃষ্টিতে দেখলে সবই মিথ্যা।

কিন্তু তা জেনে আমার কি লাভ? আমাকে এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে হবে, সাধনা করতে হবে, সিদ্ধ হ'লে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে মুক্ত হবো। এই অজ্ঞান অবস্থা মিথ্যা ব'লে ধারণা করলে চলার পথে থাকে কি? ঐ যেমন স্বপ্ন সম্পর্কে বলছেন—'ন তত্র রথা ন রথযোগাঃ ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে।' স্বপ্নে রথে চড়ে যাচ্ছি। সেখানে রথ, ঘোড়া, পথ কিছুই নেই। চলাটাও মিথ্যা। স্বপ্নদ্রষ্টা রথ. ঘোড়া. পথ—সবই সৃষ্টি করছে; চলাও সৃষ্টি করেছে। তা হ'লে আমরা সাধনা করছি, কিংবা সিদ্ধি লাভ করছি—সবই স্বপ্ন। এই দৃষ্টিতে মাণ্ডূক্যকারিকাতে বলা আছে: ইন্দ্রিয় নিরোধ, জ্ঞানের উৎপত্তি, বন্ধন. সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত এসব কিছুই নেই। এটি হ'ল পরমতত্ত্ব। বন্ধন থাকলে তবে তো মুক্তি। সুতরাং 'নেতি নেতি' ক'রে পরমতত্ত্ব জানা যায়।

কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞানে লাভ কি? আমি একটি ব্যক্তি। অন্ধকারে অগাধ সমুদ্রের কূলকিনারা পাচ্ছি না—আমার উদ্ধারের উপায় কি?

বেদান্তমত ও ভক্তিপথ

শাস্ত্র তাই বলছেন, প্রথমে সব মিথ্যা ব'লে ধরে নিলে সাধন পথে অগ্রসর হ'তে পারবে না। বেদান্ত শাস্ত্রের এটি প্রধান কথা—জগৎ ও জীবভাবকে অবলম্বন ক'রে সাধনা করতে হবে, বিচার করতে হবে। সেজন্য বলছেন, সত্য ও মিথ্যা দুটিকে একত্র মিলিয়ে সব ব্যবহার হচ্ছে। তাই শাস্ত্র নিজেকে ও জগৎকে সত্য ব'লে ধরে নিয়ে এগোতে বলছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতভাবে এটি কতকটা স্বীকৃত হয়েছে। ঠাকুরও বলছেন, জগৎ স্বপ্নবৎ নয়, 'তা হ'লে ওজনে কম পড়ে।'

এখন প্রশ্ন ওঠে, ঠাকুর কি তবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী? ঠাকুর যে 'কোন্'-বাদী নন, তা আমরা জানি না। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—সবই এবং পরেও যদি কোন-বাদী থাকে—তিনি তা-ও। ঠাকুর বেদ-বেদান্তকে অতিক্রম ক'রে যেতে বলতেন। তার অর্থ বেদকে তুচ্ছ করা নয়। বেদ যে সীমিত-ব্যবহারের মধ্যে, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য ঠাকুর এ-কথা বলেছেন। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন বৃত্তিজ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হয়। বেদই বলছেন, জ্ঞান হলে, 'তত্র···বেদা অবেদাঃ' (বৃহদারণ্যক ৪. ৩. ২২)—বেদ অবেদ হয়ে যায়। সুতরাং আমরা যতক্ষণ জগতের ব্যবহারের মধ্যে আছি, আমাদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হ'য়ে আছে বুঝতে হবে। সেজন্য সেই 'আমি'কে নিয়ে বলা সম্ভব নয়, 'জগৎ স্বপ্নবৎ'। আমরা বেদান্তের প্রয়োগ ভুলে যাই। এক বেদান্তীর সম্বন্ধে কিছু অপবাদ শুনে ঠাকুর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তার উত্তরে বলেন, 'দুনিয়া তিনকালমে ঝুটা হ্যায়', যা শুনছ, তা কি ঝুটা নয়? ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে বেদান্তীকে ধিক্কার দিলেন। ঠিক এইরকম এক ভূমি থেকে আর এক ভূমিতে গিয়ে আমরা বেদান্তের অপপ্রয়োগ করি। আচার্য শঙ্কর এজন্য ব্যাবহারিক সত্তাকে স্বীকার করেছেন। যতক্ষণ আমি-বোধ আছে, ততক্ষণ এই শক্তির এলাকায় থাকতে হবে। এই যে ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি—এর ইন্দ্রজাল থেকে আমি মুক্ত নই। তিনি যদি মুক্ত ক'রে দেন, তবেই মুক্তি সম্ভব। তিনি বন্ধনের ভিতর ফেলেছেন, আবার তিনিই মুক্ত করবেন। ঠাকুর তাকেই 'রামের ইচ্ছা' বলছেন। এই বন্ধন-মুক্তির জন্য শাস্ত্রপাঠ, সেই পথ ধ'রে সাধন করা—এ সব প্রয়োজন। বিচার অথবা উপাসনা ক'রে এই মায়াজাল কাটাবার সাধনা করতে হবে।

'তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্' (চণ্ডী ১৩.৪)—সেই

পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হ'লে মুক্তির উপায় তিনি ক'রে দেবেন। পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, শিব-শক্তি যে নামই বলি, এক কথা। ভক্তির পথে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া, জ্ঞানের পথে নিজের স্বরূপ বা ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করা—যে ভাবে যে পারে করবে ও করে, সেই সত্যস্বরূপ হয়ে গেলে বিন্দু ও সিন্ধুতে কোন পার্থক্য থাকবে না।

বার

কথামৃত—১।১৪।১-২

বলরামগৃহ ও ভক্তসমাবেশ

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে মাস্টারমশায় বলছেন ঠাকুরের বার বার বলরাম-মন্দিরে আসার কারণ। বাগবাজারে, ঐ বাড়ীর কাছাকাছি অনেক ভক্ত—বিশেষতঃ গৃহী ভক্তেরা থাকতেন; তাঁদের সাথে ওখানে দেখা হ'ত। ঠাকুর সকলের কাছে বলতেন, 'বলরামের বাড়ীতে ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন।' তার অন্ন গ্রহণে ঠাকুরের আপত্তি নেই। তবে আসল কথা, কাছাকাছি ভক্তদের ডেকে আনা যায়। এইজন্য তাঁর বলরাম-মন্দিরের প্রতি আকর্ষণ। ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতে পারতেন ভাল, যাঁরা তা পারতেন না তাঁরাও বাদ যেতেন না। ঠাকুর নিজে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন। বলরাম-মন্দিরে এই ভক্ত-সম্মিলন হয় বলে এই বাড়ীর প্রতি ঠাকুরের এত আকর্ষণ। অনেক বিশিষ্ট ভক্তের সঙ্গে তাঁর এখানেই প্রথম সাক্ষাৎ হয়—যেমন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ। এইখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এইখানেই কতবার 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে!' ঠাকুর বলেন, "যাও—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো।

এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।" তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য এদের তাঁর কাছে টেনে আনা।

মাস্টারমশায়ের প্রসঙ্গ উঠেছে। তিনি কাছেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে পড়ান। স্কুলের যারা ভাল ছেলে, শুভ সংস্কার আছে যাদের, তাদের কল্যাণের জন্য তিনি ঠাকুরের কাছে ছেলেদের নিয়ে আসতেন। তিনি যেন নিষ্ঠার সঙ্গে এ কর্মটি করতেন। সাধারণ লোকের এতে অরুচি। তাঁদের মতে, ছেলেরা বিগড়ে যাচ্ছে; তাঁরা মাস্টারমশায়ের নামে দোষ দিচ্ছেন। ছেলেরা ঐহিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে ভগবান, ভগবান ক'রে কাটাচ্ছে। এ ভয়ানক অপরাধ।

জ্ঞানসাধন ও গুরুসেবা

আজ বলরাম-মন্দিরে এসে মাস্টারমশায় দেখলেন, অল্পবয়স্ক ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘিরে আছে। তখন দুপুরবেলা, বয়স্ক ভক্তেরা কাছে গিয়েছেন। এরা যারা স্কুল কলেজে যায়, তারা হয়তো কামাই ক'রে এসেছে ঠাকুরের কাছে। মাস্টারকে দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্কুল নাই?' তদুত্তরে মাস্টারমশায় জানালেন যে, স্কুলে এখন বিশেষ কাজ নেই ব'লে এসেছেন। একটি ভক্ত রহস্য ক'রে বলছেন যে, ছেলেরাই কেবল স্কুল পালায়—তা নয়, মাস্টারও পালিয়ে এসেছে! মাস্টারমশায় স্বগতোক্তি করছেন, 'হায়! কে যেন টেনে আনলে!' ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হলেন, এতে কাজের কোন অবহেলা, ত্রুটি হ'ল কিনা, অথবা দোষ হবে কি না, এই ভেবে। মাস্টারমশায়কে ঠাকুর এর পর একটু সেবা করতে বললেন। মাস্টারমশায় ভাবছেন 'মাস্টার সেবা করিতে জানে না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন।' গীতায় আছে, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন

ও সেবার দ্বারা জ্ঞানলাভ করতে হয়। ঠাকুর যেন সেজন্য মাস্টার-মশায়কে দিয়ে সেবা করিয়ে নিয়ে উপদেশ প্রদান করছেন। অবশ্য সে উপদেশগুলির উল্লেখ এখানে নেই।

ঠাকুরের ঐশ্বর্য ত্যাগ

ঠাকুর মাস্টারমশায়কে তাঁর বর্তমান একটি বিশেষ অবস্থার কথা জানাচ্ছেন। কোনও ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করতে পারছেন না। শৌচে যাবার সময় গাড়ু—গামছা ঢাকা দিয়ে ধরলেও খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। বলছেন, 'হাত ঝন্‌ঝন্ ক'রতে লাগল।' ঠাকুরের এ-রকম ভাব কেন হ'ত—তা আমরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারব না। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলছেন, মনের ভিতর যেন একটা সংস্কার জন্মে গিয়েছে, ধাতু স্পর্শ করা চলবে না। মনের সেই সংস্কারের ফল এটি। ধাতু বলতে সাধারণতঃ মুদ্রা বোঝায়। উপনিষদে আছে, 'তস্মাদ্ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন ন স্পৃশেৎ'—কোন সন্ন্যাসী সোনা স্পর্শ করবে না, তা'হলে আসক্তি আসবে। উপনিষদ্ পাঠ ক'রে ঠাকুর এ-কথা বলছেন না। এগুলির উপলব্ধি জগন্মাতা যেন তাঁর মধ্য দিয়ে করাচ্ছেন। তাঁকে ধাতু স্পর্শ করতে দিচ্ছেন না। ঠাকুরের ভাব থেকে আমরা তাঁর ঐশ্বর্যত্যাগের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাচ্ছি।

নরেন ও গিরিশ

ছোট নরেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে ঠাকুর তার খুব প্রশংসা ক'রে বলছেন, 'সে এখানে যাওয়া-আসা করছে, বাড়ীতে কিছু বলবে।' অনেক সময় ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসাতে বাড়ীর লোকেরা প্রতিবাদ ক'রত। ইতিমধ্যে উপস্থিত ভক্তদের মধ্য থেকে কেউ মনে করিয়ে দিলেন, মাস্টারমশায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশায় বিদায়

নিয়ে স্কুল-ছুটির পর প্রবল আকর্ষণে আবার এলেন। এসে দেখলেন, ঠাকুর ভক্তদের মজলিস ক'রে বসে আছেন। মুখে মধুর হাসি, সে হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই হচ্ছে আনন্দের সংক্রামিকা শক্তি; তিনি নিজে আনন্দময়, সেই আনন্দপ্রবাহ আশে পাশে ভক্তদের মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে। ঠাকুর গিরিশকে বলছেন, "তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।" গিরিশবাবু অতিশয় বিশ্বাসী। ঠাকুর বলতেন, গিরিশের বিশ্বাস পাঁচ সিকে পাঁচ আনা, বা গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। সেই গিরিশ যখন নরেন্দ্রের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেন ঠাকুর তখন খুব আনন্দ পেতেন। উভয়েই বুদ্ধিমান্ ভক্ত; একজন নিজে পরখ না ক'রে কিছু বিশ্বাস করেন না, অন্য জন দৃঢ় বিশ্বাসী। বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন এই দুজনেই কিন্তু ভক্ত। ঠাকুরের এইটি বৈশিষ্ট্য; বিভিন্ন ভাবের ভাবুককে তিনি আপনার মনে করতেন। যে যে-ভাবের, তাকে সেই ভাবে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতেন। মাস্টারমশায়কে দিয়ে তিন সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন, 'বল, আর তর্ক করবে না।' মাস্টারমশায় বলেছেন, আর তর্ক করবেন না। কিন্তু যারা স্বভাবে তার্কিক তাদের বারণ করছেন না। নরেন্দ্রকে তর্ক করতে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'যা কিছু ব'লব, আমার কথা যাচিয়ে বাজিয়ে নিবি। আমি বলছি বলেই কখনো মেনে নিবি না।' সেজন্য গিরিশবাবুকে বলছেন নরেন্দ্রর সঙ্গে বিচার করতে। গিরিশ বলছেন, "নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দেখি, শুনি—জিনিসটি, কি ব্যক্তিটি—সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ)—তার আবার অংশ কি ? অংশ হয় না।"

ঈশ্বর ও অবতার

ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু—মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝানো যায় না। অনুভব হওয়া চাই।" অনন্তের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুর উপমা চলে না। আর একটি অনন্ত থাকলে তবে উপমা হয়; তাই তিনি অনুপম।

তিনি অনন্ত হয়েও কি ক'রে অবতার হয়ে আসেন? এটি আমাদের বুদ্ধির অতীত। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে বলি, 'ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।' পুরাণাদিতে বলে, 'গোলোক থেকে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।' কিন্তু যখন তিনি আসেন সে সময় কি গোলোকের সিংহাসন খালি থাকে? এটা কল্পনাতীত। পুরাণে অনেক সময় দেখি ব্রহ্মা এসে বলছেন, 'ঠাকুর তুমি ফিরে চল। অনেক দিন গোলোক ছেড়ে এসেছ, আমরা তোমার অভাব বোধ করছি।' অর্থাৎ পৃথিবীতে এসেছেন ব'লে গোলোকে তিনি নেই। মানববুদ্ধি অনুসারে পুরাণের এই কল্পনা। আমরা যখন কলকাতা থেকে কাশী বা অন্য কোথাও যাই, তখন নিশ্চয় আমরা কলকাতাতে নেই। ভগবান সম্বন্ধে সেইরকম কল্পনা করি। তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বর্গের সিংহাসনটি নিশ্চয় খালি পড়ে রয়েছে। সীমিত বুদ্ধি নিয়ে মানুষ ভগবানকে সীমিতরূপে কল্পনা করছে। কিন্তু যাঁর শুদ্ধ বুদ্ধি, তিনি দেখেন তিনি অনন্ত, গোলোক থেকে যখন বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হলেন, তখন গোলোক শূন্য হ'লে তিনি কি ক'রে অনন্ত হবেন? তা হ'লে তো ভগবান গোলোকের ভিতর সীমিত হয়ে গেলেন। নরেন্দ্রর মতে ভগবান অনন্ত—Infinite, তাঁর অংশ হয় না। উপনিষদ্ বলছেন:

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

(বৃহ. উ. ৫ ১. ১.)

যা কিছু আমরা দেখছি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ কার্য—তা পূর্ণ এবং যা কিছু দূরে অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ কারণ, তাও পূর্ণ। পূর্ণ কারণ থেকে পূর্ণ কার্যের আবির্ভাব হয়। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রও এ-রকম বলে; অনন্ত যিনি, তাঁর থেকে অনন্ত বাদ দিলে অনন্তই অবশিষ্ট থাকে, অনন্তের অংশ হয় না। অংশ কেন হয় না? আকাশ সর্বব্যাপী; তাকে যা দিয়ে বিভাগ করা যাবে, এমন কোন বস্তু আছে কি? সমুদ্রের জলকে একটা ঘটে তুলে বিভাগ করা যায় কিন্তু সমুদ্র আকাশের মতো সর্বব্যাপী হ'লে তাকে আর বিভাগ করা যেত না। ঘট দিয়ে আকাশকে ভাগ করা যাবে না; সে সর্বত্র পরিপূর্ণ ঘটের বাহির-ভিতর পূর্ণ ক'রে রয়েছে। সীমিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অংশ হয়। তাই ভগবানের অবতার তাঁর অংশ হ'লে তাঁর থেকে কিছুটা কমে গেল—এটা অবাস্তব, এ অলীক কল্পনা। তাই বলেছেন—অংশ হয় না। পরিপূর্ণ যা, তাঁর বিভাগ এভাবে হয় না।

কিন্তু ঠাকুর বলছেন, "তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে।" আসতে পারে শুধু বললে এটি একটি সিদ্ধান্তের কথা হ'ত মাত্র। ঠাকুর জোর দিয়ে বলছেন, 'আসে', কারণ এ তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি। পূর্ণ তিনি, কেমন ক'রে ক্ষুদ্র হয়ে মানুষরূপে আসেন, এ কল্পনা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়, এ তার বুদ্ধির অগম্য। ভাগবতে দেবকীর একটি অপরূপ উক্তি আছে, 'আমি ক্ষুদ্রকায়া নারী, দেবকী, আমার গর্ভে অতি ক্ষুদ্র শিশুরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন—এ কল্পনাতীত।' যিনি অনন্ত, তিনি কি ক'রে এতটুকু হলেন? ঠাকুর বলছেন, তিনি অনন্তই হোন আর যত

বড়ই হোন, তিনি ইচ্ছা করলে অবতার হয়ে থাকেন। কি ক'রে সম্ভব হ'ল, তা বোঝানো যায় না। কারণ দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নেই যা দিয়ে বোঝানো যাবে।

দৃষ্টান্ত নেই, কিন্তু যদি কারো অনুভব হয়, তাকে অস্বীকার করা যায় না। অনুমান গৌণ, অল্পশক্তি, সে অনুভবের উপর নির্ভর করে। অনুভবের উপর ভিত্তি ক'রে যদি কেউ বলে, 'আমি জেনেছি, স্পষ্ট দেখেছি, আমার বুদ্ধিগম্য এটা', তাকে আর অস্বীকার করা যায় না। তাই বলছেন, উপমা দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবান অনুপম, তাঁর মতো আর একটি থাকলে উপমা সম্ভব হ'ত। ভাগবতে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। সুতপা ঋষি ও পৃশ্নি ভগবানকে সন্তান-রূপে পাবার জন্য তপস্যা করায় তিনি আবির্ভূত হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তাঁরা বললেন, 'তোমার মতো একটি সন্তান চাই।' ভগবান বললেন, তথাস্তু'। কিন্তু তাঁর মতো সন্তান ত্রিলোকে কোথাও খুঁজে পেলেন না ; বলছেন ঃ

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ॥

(ভাগবত ১০ ৩.৪১)

আমি চতুর্দিক খুঁজে আমার মতো উদার গুণযুক্ত আর একটিও পেলাম না। বাধ্য হয়ে আমি নিজেই তোমাদের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করব। কবিত্বপূর্ণ সুন্দর ভাষায় বলা হয়েছে, তাঁর উপমা তিনি। তাই 'ন তস্য প্রতিমাস্তি'—এই ভগবান যিনি অনন্ত, তাঁর কোন প্রতিমা, অনুরূপ কোন বস্তু নেই। এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ঠাকুর বলছেন, 'উপমা হয় না।'

গিরিশ বলেন, তিনি অবতার হয়ে আসেন, তাঁর ভিতর দিয়ে লোককল্যাণকারিণী ঐশী শক্তি কাজ করে। গরুর ভিতরে দুধ আছে, কিন্তু আসে বাঁট দিয়ে। তিনি সর্বব্যাপী হলেও তাঁর লোককল্যাণ-

কারিণী শক্তি অবতারের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। কি ভাবে প্রকাশ পায়? প্রেমভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ-দেহ ধরে সময় সময় অবতীর্ণ হন।

গিরিশের এ কথায় নরেন্দ্র বলেন, 'তাঁর কি সব ধারণা করা যায়? তিনি অনন্ত।' নরেন্দ্র তর্কে বিশারদ, কিন্তু ঠাকুরের দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের কথার ভুলটুকু ধরা পড়েছে। তিনি তাই বলছেন, "ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে?" সব ধারণা কেন, একটু ধারণাও হয় না। অবিভাজ্য অখণ্ড যিনি, তার সব যা, একটুও তাই। "তা তাঁর বড ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না।" আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'ল। যে অবতারের মধ্যে তাঁর শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে, তাঁকে দেখলেই কি ঈশ্বরকে দেখা হ'ল না? "যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা, হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না।" সেইরকম, অবতার ভগবানের একটি বিশেষ প্রকাশ, তাঁকে দেখলেই ভগবানকেই দেখা হ'ল। বাইবেলে আছে, 'He who has seen the son, has seen the Father'—যে সন্তানকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। যীশু নিজেকে ভগবানের সন্তান বলছেন। তিনি বলতেন, 'Son of the MAN'. 'MAN' শব্দটি Capital letter (বড় হাতের অক্ষর)-এ আছে, ঈশ্বরের সন্তান কথাটি বোঝায়। অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। পঞ্চভূত দিয়ে সব তৈরী, সব জায়গাতেই অগ্নি আছে, কিন্তু কাঠে তার প্রকাশ বেশী। এই জন্য গিরিশ বলছেন, 'যেখানে আগুন পাবো, সেখানেই আমার দরকার।' তিনি সর্বত্র আছেন, কিন্তু যদি অবতারের সান্নিধ্য পেয়ে তার সান্নিধ্য লাভ হয়, তা হ'লে তিনি যে অনন্ত, তাতে আমার কি দরকার? এই এক জায়গাতেই সব পেয়ে গেলাম!

অবতার শক্তির প্রকাশ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে।" কথাটি চমৎকার, অনুধাবনযোগ্য। মানুষ তার অনুভব-শক্তির সাহায্যে মানব-রূপী তাঁকে বেশী বুঝতে পারবে। এজন্য বলছেন, "মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেন—তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।" যেমন গীতার কথা :

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
(১০.৪১)

ভগবান বলছেন, আমারই তেজের থেকে সেই সব বস্তু উৎপন্ন হয়েছে। যেখানে দেখবে শ্রী, সৌন্দর্য, শক্তি, ঐশ্বর্যের প্রকাশ—জানবে সেখানে আমি। তাই মানুষের মধ্যে ভগবদ্-অনুভূতি যেমন প্রবল, অন্য কোথাও তেমন হয় না। ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন যে, 'ভাব অবধি মানুষের হ'তে পারে ; মহাভাব, প্রেম—অবতার ছাড়া হয় না।' আরো ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশিত, কোথাও কম। "অবতারের ভিতর তাঁর শক্তির বেশী প্রকাশ ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।" অবতার মানে ভগবানের শক্তি যেন আকার নিয়ে আবির্ভূত, তাঁর প্রকাশের দ্বারা এ জগৎ প্রকাশিত, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' কাজেই যেমন অবতারের ভিতর তেমনি যে নির্বোধ অবিকশিত আত্মা, তার ভিতরেও তাঁরই প্রকাশ। কোথাও বেশী, কোথাও কম। অবতারে বেশী প্রকাশ, কারণ সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে।

তারপর ঠাকুর বলছেন, 'শক্তিরই অবতার'। এ শব্দটির যেন ভুল অর্থ না করি। শক্তি কোন বিশেষ দেবী নয় ; ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

করছেন যে শক্তির প্রভাবে, সে শক্তি আর তিনি অভিন্ন। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি এবং সেই শক্তিরই অবতার হয়ে তিনি লীলা করছেন। সৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন।

'তিনি শুদ্ধমনের গোচর'

গিরিশ বলছেন, 'নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—বাক্য-মনের অগোচর। উপনিষদ্ বার বার বলছেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' (তৈত্তিরীয় ২.৪.১.)—যেখান থেকে বাক্য মনের সঙ্গে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে। অর্থাৎ শব্দ বা কথার ভিতর দিয়ে আমরা তাঁকে প্রমাণ করতে পারি না। মনের দ্বারাও তাঁকে ধারণা করতে পারি না। মন তাঁরই একটা ক্ষুদ্র কার্য মাত্র, তাই তিনি বাক্য-মনের অগোচর। নরেন্দ্রের এই কথার প্রতিবাদ ক'রে ঠাকুর বলছেন, "না; এ মনের গোচর নয় বটে—শুদ্ধ মনের গোচর।" ঠাকুরের এ-কথা স্পষ্ট উপনিষদেরই কথা :—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
(কেন. ১.৬.)

এক জায়গায় বলছেন, মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। আবার অন্যত্র বলছেন, 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'—মনের দ্বারাই সেই বস্তুকে পেতে হবে। কথা দুটি আপাতবিরোধী। ঠাকুর যে সমাধান ক'রে দিয়েছেন, সেইটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তিনি শুদ্ধ মনের গোচর, আমাদের যে মনের সঙ্গে পরিচয় সেই অশুদ্ধ মনের গোচর তিনি নন। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক। মনকে যখন (শুধু মন কেন, যে কোন বস্তুকে) শোধন করি, তার উপর আরোপিত ধর্ম—আবরণগুলিকে

সরিয়ে দিই, তখন যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ঈশ্বর স্বয়ং। শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা তাই এক। যিনি আত্মাকে জেনেছেন, তিনি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম ক'রে তিনি অসীমত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর ঐ অসীম রূপই সত্য, সীমিত ব'লে যা দেখছি, তা আরোপিত; দ্রষ্টার ভ্রান্ত বুদ্ধি দূর হ'লে শুদ্ধস্বরূপ তিনি শুদ্ধেই ফিরে যান। মন বুদ্ধি যখন চিন্তা করে, আত্মশক্তির প্রভাবে চিন্তা করে। কিন্তু যখন বিশ্লেষণ ক'রে তার চৈতন্য ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়—সেটাই মনের শুদ্ধ স্বরূপ। সুতরাং বাক্য-মনের অগোচর যিনি, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর হন।

ঠাকুর এর পর বলছেন, "ঋষি-মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।"

এটি ভাববার কথা। দেখা বা অনুভব করা অন্য কোন করণ বা যন্ত্রের সাহায্যে হয় না। চোখ, কান বা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বস্তু অনুভব করি। ইন্দ্রিয় ও বস্তু উভয়ে থাকলে তার অনুভূতি হয়। কিন্তু এখানে অতীন্দ্রিয় অনুভব।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম ক'রে বস্তুর স্বরূপে স্থিতি—এই হচ্ছে অচিন্ত্য বস্তুর অনুভূতি। তাই বলছেন যে, মুনি-ঋষিরা কি তাঁকে দেখেননি, তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হননি? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। ঠাকুর বার বার বলতেন, বোধে বোধ হওয়া, অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধির দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যের অনুভূতি। শুদ্ধ-বুদ্ধি—যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিকৃত বা সীমিত নয়—সেই শুদ্ধ-বুদ্ধি ও আত্মা এক, সেজন্য চৈতন্যের দ্বারাই চৈতন্যের অনুভূতি। অনন্ত থেকে পৃথক্ করে রাখছে যে সীমা বা ধর্ম বা গুণ, সেইগুলি অন্তর্হিত হ'লে শুদ্ধ-বুদ্ধির দ্বারা শুদ্ধ-বুদ্ধির উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মারূপেই অবস্থান করে।

তের

কথামৃত—১।১৪।৩

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে এসেছেন। এ বাড়ী যেন তাঁর বৈঠকখানা। ঠাকুর গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গিরিশের রচিত "কেশব কুরু করুণা দীনে,…" গানটি গাওয়া হ'ল। গানটি ঠাকুরের খুব পছন্দ। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, গিরিশই 'চৈতন্যলীলা'র সব গান রচনা করেছেন। এ গানটি স্টেজে কোরাসে গাওয়া হ'ত। একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে মেয়েরা, এক ছত্র ক'রে পর্যায়ক্রমে গাইত। গানটি এমনভাবে রচিত যাতে ব্রজের গোপ ও গোপীদের—দুটি ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষ, অন্যদিকে তাঁর মনোমোহন রূপ প্রকাশিত হচ্ছে।

ঠাকুরের নির্দেশে গায়ক তারাপদ নিতাই-এর "কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়" গানটি গাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে 'কিশোরী' বলা হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখে তাঁর ভাব অনুভব ক'রে নিতাই গাইছেন। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু—শ্রীরাধার ভক্তি, ভাব ও অঙ্গকান্তি গ্রহণ ক'রে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব অবলম্বন ক'রে 'কার ভাবে গৌর-বেশে নদে এসে জুড়ালে হে প্রাণ', গানটি হ'ল। তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ, এইটি এ-গানে বোঝানো হয়েছে।

সকলে মাস্টারমশায়কে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। মাস্টারমশায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠ ছিল, মেয়েদের মতো মিহি, খুব ভাবের সঙ্গে গান গাইতে পারতেন, কিন্তু খুব লাজুক, তাই ফিস্‌ফিস্ ক'রে মাপ

চাইছেন। কেউ লাজুক স্বভাবের হ'লে সকলে মিলে তাকে নিয়ে যেমন করে, সেই-রকম গিরিশ সহাস্যে ঠাকুরকে বলছেন, "মহাশয়, মাস্টার কোন মতে গান গাইছে না।" মাস্টার আরো সংকুচিত হচ্ছেন। গান না করায় ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন, "ও স্কুলে দাঁত বার করবে ; গান গাইতে যত লজ্জা!" ঠাকুর অনেক সময় নারীভাবব্যঞ্জক গান-গুলি তাঁকে গাইতে বলতেন, তাঁর মিষ্টগলায় এই গানগুলি চিত্তাকর্ষক হবে ব'লে এখানে গাইতে বলছেন ; তিনি লজ্জা পেলেন। ঠাকুর তাঁর ভক্তদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন। কারো ভিতরে একটি গুণ দেখলে তা বাড়ানোর এবং অন্যেরা যাতে সে গুণের সমাদর করে, সে চেষ্টা করতেন। তিনি সুরেশ মিত্রকে বলছেন, "তুমি তো কি ? ইনি (গিরিশ) তোমার চেয়ে!" অর্থাৎ শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে। ঠাকুরের কথায় সুরেশ বললেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা।"

গিরিশ এর পর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া না করলেও লোকে বলে বিদ্বান্। এই বিদ্যাবত্তার ভাবটি কেমন, দেখাবার জন্য ঠাকুর বলছেন মাস্টারমশায়কে, "মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে—খুব আধার! (মাস্টারের প্রতি)—কেমন গা ?" মাস্টারমশায় বললেন, "আজ্ঞা, হাঁ।" গিরিশ বলছেন, "কি ? বিদ্যা! ও অনেক দেখেছি! ওতে আর ভুলি না।" ছেলেবেলায় না করলেও গিরিশ ঘোষ পরে বিদ্যাচর্চা করেছেন অনেক। এখন ঠাকুরের পাদপদ্মে এসে নতুন বিদ্যা শিখতে শুরু করেছেন। তাই বলছেন, "ওতে আর ভুলি না।" বিদ্যার অসারতা বুঝেছেন।

শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

গিরিশের এই নিরভিমান ভাবটি ঠাকুরের পছন্দ হওয়ায় হাসতে হাসতে বলছেন, "এখানকার ভাব কি জানো ? বই শাস্ত্র এ-সব কেবল

ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।" হারানো চিঠির কথা বললেন। চিঠি খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল তাতে লেখা আছে, পাঁচ সের সন্দেশ, একখানা কাপড় ইত্যাদি পাঠাবার কথা। তখন চিঠি ফেলে দিয়ে জিনিষের সন্ধানে বেরোতে হয়। শাস্ত্র ভগবানের কাছে পৌঁছবার পথ ব'লে দেয়, কিন্তু বই বন্ধ ক'রে বসে থাকলে বা লোকের কাছে সেগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে কি হবে? শাস্ত্রের তাৎপর্য বা সার্থকতা তখনই হবে, যখন সব জেনে বুঝে নিয়ে জীবনে সেগুলি কাজে লাগানোর চেষ্টা হবে। তার আগে পর্যন্ত তা শুধুই চিঠির খবরের মত সংবাদ বা পাণ্ডিত্য মাত্র। ভগবান লাভের উপায় জেনে নেওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রের মূল্য—তারপর চিঠির মতো তাকে ফেলে দেওয়া। শাস্ত্রের সার্থকতা শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়াতে—ঠাকুর নানাভাবে এ-কথা বলেছেন। "শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে; কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই —মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।" ভাব হচ্ছে, কথাগুলি জীবনে কার্যকরী না ক'রে শুধু আবৃত্তি ক'রে যাওয়ায় কথার ভার বহন করা হয় মাত্র। শাস্ত্রে একে বলে, দর্বীর্ 'পাকরসাস্বাদবৎ'—হাতায় করে সুখাদ্যগুলি পরিবেশিত হচ্ছে, কিন্তু হাতা তার স্বাদ পায় না, স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয় তার নেই। পণ্ডিতও হাতা মাত্র, জড় পদার্থ। শাস্ত্র চর্চা করেন, কিন্তু জীবনে সেগুলি কার্যকর করার কোন প্রচেষ্টা নেই—তাঁর শাস্ত্র পাঠ নিষ্ফল। শাস্ত্রে বলছে, এই এই করতে হয়, এইভাবে

সমাধি হয়। বড় বড় সে-সব কথা মুখস্থ ও আবৃত্তি ক'রে জীবনে কি ফললাভ হ'ল?

স্বামীজী বলছেন, অনেক প'ড়ে শুনে মানুষটা হয় পণ্ডিতমূর্খ। ঠাকুর বলছেন, 'পণ্ডিতকে খড়কুটো মনে হয়, যদি না তার ভিতর বিবেক বৈরাগ্য থাকে।' তার পাণ্ডিত্য বৃথা। কথার ফুলঝুরি, শব্দের স্রোত মুখ থেকে বেরোচ্ছে, এক একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হচ্ছে। তাতে লোকের কাছে বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের কি হ'ল? শঙ্করাচার্য বলছেন:

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

(বিবেকচূড়ামণি ৫৮)

এই সব ব্যাখ্যায় অর্থ, যশ মানসম্ভ্রমাদি ভোগসুখলাভ হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এর কোন দামই নেই। বরং অকাজে লাগে, পাণ্ডিত্যের অভিমান হয়। অপরকে মুগ্ধ করার জন্য যে পাণ্ডিত্য, ঠাকুরের দৃষ্টিতে তার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। ঠাকুর এক বিখ্যাত ভাগবত-পণ্ডিতের গল্প বলতেন। তিনি শাস্ত্র আলোচনা ক'রে রাজাকে জিজ্ঞাসা করতেন, রাজা বুঝেছেন কিনা। রাজাও প্রতিপ্রশ্ন করতেন—পণ্ডিত বুঝেছেন কিনা। কিছুদিন এ-রকম প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন চলার পর, পণ্ডিতের শুভবুদ্ধির উদয় হ'ল। তিনি বুঝলেন যে সারা জীবন ধ'রে তিনি কেবল ভাগবত ব্যাখ্যাই করেছেন, কিন্তু জীবনে তা কাজে লাগানো হয়নি। এই ভেবে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন। যাবার আগে রাজাকে খবর পাঠালেন, 'রাজা, এবার আমি বুঝেছি।' ভাগবত বলেছে—মন শুদ্ধ ক'রে ঈশ্বরে তা সমর্পণ করতে। যতক্ষণ তা না করা যায়, ততক্ষণ যথার্থ বোঝা হয় না। ঠাকুর তাই বলছেন যে, পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কাম-

কাঞ্চনে, দেহসুখ ও টাকায়। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে, কেবল খুঁজছে কোথায় মরা গরু।

আবার হয়তো নরেন্দ্রর দিকে নজর পড়েছে, তাই গিরিশকে বলছেন, "নরেন্দ্র খুব ভাল ; গাইতে, বাজাতে, পড়ায় শুনায় বিদ্যায় ; এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।" মাস্টারকে সাক্ষী ধরেছেন, "কেমন গা, খুব ভাল নয় ?" মাস্টারমশায় সমর্থন জানাচ্ছেন, "আজ্ঞে হাঁ, খুব ভাল।" এ-সব কথা বলার দুটি উদ্দেশ্য আছে। এক ভক্তদের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক, সমাদর ও শ্রদ্ধার ভাব স্থাপন। দ্বিতীয়—একজনের একটি গুণের কথা বললে অন্যরা বুঝবে ঠাকুর এটির সমাদর করেন। তাঁদের মধ্যে সেটি আনার চেষ্টা করতে হবে। তাই একের কাছে অপরের প্রশংসা করতেন।

গিরিশ ঘোষ

গিরিশের প্রসঙ্গ একটু আগে করেছেন, এবার তার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলছেন, "ওর খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।" মাস্টার অবাক্ হইয়া গিরিশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাস্টার কিন্তু দেখিলেন যেন পূর্বপরিচিত—অনেক দিনের আলাপ - পরমাত্মীয়—যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটি মণি।"

গিরিশের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক অদ্ভুত, কল্পনার অতীত বস্তু। ঠাকুর গিরিশের শত অত্যাচার সহ্য করতেন। কখনো কখনো তিনি ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতেন। একটি দিনের ঘটনা— নেশাচ্ছন্ন গিরিশ ঠাকুরকে অতি অপমানসূচক দুর্বাক্য বলেছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর চলে যাবার পর গিরিশ ভাবছেন, 'এ কি কেউ সহ্য করে ? আর তাঁর কাছে যাওয়া হবে না, যদি তাঁর কাছে যেতে না পারি, আমার জীবনের কোনো সার্থকতা নেই।' ভাবছেন আর অজস্র

অশ্রুধারায় ভাসছেন। এদিকে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বলছেন, 'আমাকে গিরিশের কাছে যেতে হবে।' ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তেরা অবাক্ হয়ে ভাবছেন, গিরিশ ঠাকুরকে এমন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিলেন, তবুও ঠাকুর তাঁর কাছে যাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন! এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁদের কল্পনার অতীত। শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঠাকুর যখন শুনলেন না তখন তাঁরা গাড়ী আনালেন। যেতে যেতে ঠাকুরের ত্বর সইছে না, তাড়াতাড়ি চালাতে বলছেন। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে তিনি গাড়ী থেকে নেমে দ্রুতপদে চলেছেন। ঘরে ঢুকে গিরিশকে ঐ অবস্থায় দেখলেন। গিরিশ সাষ্টাঙ্গে পণিপাত ক'রে বললেন, 'আপনি যে অবতার, এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে? কিন্তু আমারই বা দোষ কি? যাকে বিষ দিয়েছেন, সে বিষ ছাড়া আর কি দিয়ে আপনার পূজো করবে?' ঠাকুর বুঝলেন। আগেই জানতেন, তার মন ব্যাকুল হয়েছিল, তাই স্বয়ং এসে গিরিশের মনকে শান্ত করলেন।

পার্ষদদের সঙ্গে ঠাকুরের এইরকম নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। তিনি বলতেন, কাকেও দেখলে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ি কেন জানিস? বহুকালের পরিচয়, কিন্তু অনেক দিন অদর্শনের পর হঠাৎ মিলন হ'লে প্রাণটা যেমন লাফিয়ে ওঠে তাকে গ্রহণ করার জন্য, সেইরকম একেবারে তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠি।' অন্তরঙ্গ কিনা বাছবার এই প্রক্রিয়া। অবশ্য গিরিশকে এত ভালবাসলেও তাঁর ত্যাগী সন্তানদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, 'দেখ গিরিশ খুব ভাল, কিন্তু রসুন-গোলা বাটি, রসুনের গন্ধ যায় না।' অর্থাৎ ত্যাগী সন্তানদের গায়ে যেন এ গন্ধটি না লাগে। যে গিরিশকে এত ভাল ব'লে প্রশংসা করছেন, তার থেকেও ভক্তদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন। গিরিশ ঠাকুরকে কটুকথা বলেন, ঠাকুর খুশী হয়ে তাই গ্রহণ করেন দেখে এক ভক্ত ভাবল এই

রকম গাল দিলে বুঝি ঠাকুর খুশী হন। তিনি একবার গিরিশের অনুসরণে, অতটা না হলেও সেইরকম স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করছেন দেখে ঠাকুরও হেসে বলছেন, 'ওরে, ওটা তোর ভাব নয়।' গিরিশের বা তাঁর নরেন্দ্রের পক্ষে যা পথ্য, অপরের পক্ষে তা নয়। ঠাকুর এ ব্যাপারে খুব সতর্ক হয়ে হিসাব ক'রে দেখেন, কার কি পথ্য হওয়া উচিত। অপরের অনুকরণ এভাবে করলে অকল্যাণ হবে। একদিন তারককে (স্বামী শিবানন্দ) ঠাকুরের কথাগুলি নোট করতে (টুকতে) দেখে হেসে বললেন, 'ও তোর জন্য নয়, ওজন্য অন্য লোক আছে।' আবার শ্রীম লিখে রাখতেন ব'লে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা, সেদিন ওমুক বাড়ী গিয়ে কি বললাম, বলো দেখি?' মাস্টারমশায় উত্তর দিলে বলতেন, 'আর কি বলেছি?' এমনি ক'রে সমস্ত দিনের ঘটনাটি মাস্টারমশায়ের মনে আছে কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। আবার সংশোধন ক'রে বলতেন, 'না, ও কথা বলিনি, এই কথা বলেছি।' এ যেন ছাপার পর ভুল সংশোধনের জন্য যেমন প্রুফ (proof) দেখা হয় সেইরকম। শ্রীমকে দিয়ে এই কাজ করাবেন ব'লে তাকে এইভাবে তৈরী করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ

তেমনি আবার নরেন্দ্রনাথকে সংঘনেতারূপে তৈরী করছেন। তাঁর বয়স তখন অনেকের চেয়ে কম হলেও তিনি তার ভিতর ভবিষ্যৎ নেতাকে দেখছেন। সাক্ষাৎভাবে সকলকে বলছেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।' তাঁর গুরুভাইয়েরা জেনে নিয়েছেন যে, নরেন্দ্র তাঁদের ঠাকুরের নিয়োজিত নেতা এবং তাঁদের নরেন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য ক'রে চলা উচিত। তাই তাঁরা মতভেদ সত্ত্বেও নরেন্দ্রের নেতৃত্ব অকুণ্ঠভাবে বরণ ক'রে নিয়ে তাঁর আজ্ঞাবহ থেকেছেন। আগে থেকে ঠাকুর তাঁকে

এইভাবে তৈরী করেছেন। গিরিশকেও বিশ্বাসের দৃষ্টান্তরূপে দাঁড় করাবার জন্য তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রকম ক'রে তাঁর পার্ষদদের ভিতর এক-একটি অলৌকিক দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁরা এক-একজন এক-একদিকের দিক্‌পাল হয়ে উঠেছেন। এক-একজনের মধ্যে এক-একটি বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছে, সেটিকে পরিপূর্ণভাবে জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাকে উৎসাহিত করছেন. আবার অন্য কেউ তা অনুকরণ করলে তাকে নিষেধ করছেন। পাকা গিন্নীর মতো কার পেটে কি সয়, তা জেনে খাদ্য পরিবেশন করছেন। তাঁরই কথা, 'যার পেটে যা সয়, মা তাকে তাই দেন।' প্রত্যেকের ভিতর পৃথক্‌ভাব বা আদর্শ ফুটিয়ে তুলছেন, তারই দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছেন।

নারায়ণ এবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর গান আর হবে কিনা। সাধারণের শুনলে মনে হবে, নারায়ণ ছেলেমানুষ, সে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছে, গান হবে কি না। প্রকৃতপক্ষে, এই রকম সম্বন্ধ ছিল। সাপুড়ের বাঁশিতে যেমন সাপ সম্মোহিত হয়ে যায়, তেমনি ঠাকুরের গানে তাঁর পার্ষদরা মুগ্ধ, অভিভূত, ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন।

সঙ্গীত ও ঈশ্বরীয় ভাব

ঠাকুর তাঁর ভক্তদের ভোরের সময় কেমন ক'রে সাধন ভজন করতে বলতেন, সেই বিষয়ে একদিন জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, 'আর বাবা! ঠাকুর খুব প্রত্যুষে উঠে মধুর স্বরে নাম করতেন। সেই নামে পাষাণ গলে যায়। তখন সাধন ভজন, ধ্যান জপ ছাড়াই মন অনেক উঁচুতে উঠে যেত। সঙ্গীতের এমনই প্রভাব, আর তাঁর কণ্ঠোত্থিত সুমধুর গানের প্রভাব আরো বেশী। ঠাকুরের ভক্তেরা বলতেন ঠাকুর এবং নরেন্দ্রের গান ছাড়া

আর কারো গান কানে লাগে না। অদ্ভুত সে সঙ্গীত!—তাকে সাধনের একটি অন্তরঙ্গ উপায় ব'লে তাঁর সন্তানেরা মনে করতেন। তাঁরা সকলেই গান করতেন এবং অনেকেই বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। অদ্ভুত সে গান! সেই গানই যখন এত মিষ্টি লাগত, তখন তাঁরা যে গানে সম্মোহিত হতেন, সে গান না জানি কত মধুর ছিল!

স্বামিজীর মতো তাঁর গুরুভাইদের অত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গভীর জ্ঞান হয়তো ছিল না; কিন্তু তাঁদের সকলেরই গানের সাবলীল ভঙ্গী যেন সমস্ত হৃদয় নিংড়ে বেরোত। যাঁরা সাধক তাঁদের ভিতরও যাতে এই সঙ্গীত-প্রীতি আসে, তাঁরা সে চেষ্টা করতেন। সঙ্গীতের আনন্দের ভিতর দিয়ে ভগবদ্-আনন্দের রস লোকের মনে আসবে, তাই সকলের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ হ'ক, ঠাকুর এই চাইতেন। ঠাকুরের সন্তানেরাও সকলেই তাই চাইতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর সেবকদের মধ্যে কয়েকজন সুকণ্ঠ গায়ক রাখতেন। সুকণ্ঠ ব'লে তিনি তাদের ভালবাসতেন এবং গান শুনতেন। মহারাজের সামনে গান হ'লে তার মর্যাদা বেড়ে যেত! একদিকে গানের সুর ভাব মাধুর্য আর অপরদিকে মহারাজের ভাব গাম্ভীর্য, মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হ'য়ে যাওয়া। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁরা সেই সংক্রামিকা শক্তির দ্বারা একেবারে অভিভূত হ'য়ে যেতেন। এই হচ্ছে সঙ্গীতের মাধুর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে মায়ের গান করছেন। 'যতনে হৃদয়ে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে', 'গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা, আমায় নিরানন্দ কোরোনা', 'শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা'—এই তিনটি গান করলেন। ভক্তেরা একদৃষ্টে ঠাকুরের আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখছেন। এই গান সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। ঠাকুর যে সব গান গাইতেন বা পছন্দ করতেন, সেগুলি বিষাদের নয়, আনন্দের গান। আর যে সব গানে 'পাপী তাপী' আছে, তা তিনি পছন্দ করতেন না।

তিনি বলতেন, 'আমি পাপী, আমি পাপী' যে বলে, সে শালা পাপী হয়ে যায়। ঠাকুরের গানের বৈশিষ্ট্য—ভাব তো পূর্ণ মাত্রায় থাকতই, গানের অন্তর্নিহিত ভাবটি তাঁর সারা দেহের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হ'ত। এইজন্য সে গানের যে অসাধারণ মাধুর্য, তা অন্য কোথাও আশা করা যায় না।

ঠাকুরের দেহমনের একতানতা

ঠাকুরের দেহমন এমন একটি যন্ত্র হ'য়ে উঠেছিল যে, যে-ভাবটি সেখানে উঠত, তা পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হ'ত। ছোট শিশু যখন সরল থাকে, তাদের মনে কোন ভাব হ'লে সমস্ত দেহের মধ্যে তা ফুটে ওঠে। তারা কথা বললে লক্ষ্য করা যায়, সমস্ত দেহ দিয়ে তারা কথা বলছে। ঠাকুরের ঠিক এইরকম ছিল। যে দেবতার চিন্তা বা ভাব মনে উঠছে, দেহটি সেই ভাবে ভাবিত হ'ত। এ-রকম অনেক দৃষ্টান্ত কথামৃত বা অন্যত্র পাওয়া যায়। যেমন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে থাকাকালে ঠাকুরের কথামত কালীপূজার আয়োজন হয়েছে। প্রতিমা আনা হয়নি, কে পূজারী হবেন, তা ঠিক হয় নি। পূজার কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঠাকুর মায়ের ভাবে এমন ভাবিত হলেন যে, তিনি বরাভয়করা হ'য়ে গেলেন। গিরিশ প্রভৃতি তখন দেখছেন যে, মায়ের জন্য আর মাটির প্রতিমা কি দরকার? এই তো মা! সাক্ষাৎ মা। তখন সকলে 'জয় মা', 'জয় মা' ব'লে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ। অলৌকিক নয়, লৌকিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, বিশেষ বিশেষ কাল-মাহাত্ম্য অনুসারে ঠাকুরের ভিতর যে ভাবটি ফুটে উঠত, সমস্ত দেহও তাতে রূপায়িত হ'ত। কালীপূজার দিন মায়ের চিন্তা মনে উঠতেই দেহটি সেই ভাবে ভাবিত হ'ল।

শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত উপাসক দীর্ঘ সাধনার পর এই অবস্থা খানিকটা

লাভ করতে পারে। উপাসনা শব্দের এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যাঁর উপাসনা করছে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে উপাসক উপাস্যে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। যাঁরাই ঠাকুরকে দেখেছেন, তাঁরাই একথা বলেছেন। শুধু শ্যামপুকুরে নয়, অন্যত্র এইরকম ঘটনা অনেক আছে। এ জগন্মাতার হাতে তৈরী এমন নিখুঁত এক যন্ত্র, যে যন্ত্রের প্রতিটি তার ভাবের সঙ্গে একসুরে বাঁধা এবং সমস্ত দেহ সেই ভাবটি চারিদিকে প্রবাহিত করছে। ভাবের এই পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি, সমস্ত দেহমন দিয়ে ভাবের এই যে অনুরণন, এ কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের মতো অবতার পুরুষদের ক্ষেত্রেই সম্ভব।

চৌদ্দ

কথামৃত—১।১৪।৪-৫-৬

ঠাকুরের আচরণ ও লোকশিক্ষা

আলোচ্য অংশের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ প্রধানতঃ বর্ণনামূলক। প্রথমে সন্ধ্যার বর্ণনা। দিন যায় রাত্রি আসে—এই সন্ধিক্ষণে কালের কি একটা মাহাত্ম্য আছে, যখন সাধকেরা সন্ধ্যা উপাসনা করেন। ঠাকুর বলতেন, কাল-মাহাত্ম্য মানতে হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ঠাকুরের মধ্যে বিশেষ ভাবের উদয় হ'ত। সন্ধ্যা হয়েছে, ঠাকুর অন্যত্র যেমন করেন, এখানে বলরাম-মন্দিরেও মধুর স্বরে নাম করছেন। সকলে উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছেন। এমন মিষ্টি নাম, যেন সুধাবর্ষণ হচ্ছে। ঠাকুরের এই মধুর নামসংকীর্তন সকলকে বিশেষ ক'রে আকর্ষণ ক'রত। যাঁরা

শুনেছেন তাঁরা চিরকাল মনে রেখেছেন। মাস্টারমশায় সেটি উপলব্ধি ক'রে বলছেন, "এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দর-রূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি পিপাসুর পিপাসার শান্তি হইবে?" ঠাকুর এর আগে অবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সমস্তই ঈশ্বর, তবে অবতার কি রকম?—'না, গরুর বাঁট দিয়ে যেমন তার দুধ আসে, তেমনি অবতারের ভিতর দিয়ে ভগবানের বিশেষ ভাব—বিশেষ শক্তির প্রকাশ।' যে বিশেষ অমৃত তিনি বর্ষণ করছেন, তা তাঁর মতো অবতারের ভিতর থেকেই প্রবাহিত হয়। নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর শিশুর মতো সরল ভাষায় প্রার্থনা করছেন। মাস্টারমশায়ের মনে এই বিশেষ চিন্তা এল, যিনি সর্বদাই তাঁর নাম করছেন, তাঁর আর সন্ধ্যাকালে নাম করবার কি প্রয়োজন? পরক্ষণেই ঠাকুরের আর একটি দিক তাঁর মনে প'ড়ল, লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করেছেন। অতএব লোক-শিক্ষার জন্য যা করা দরকার, তাই করছেন। সন্ধ্যাবেলা জীবকে নাম-গুণগান করতে শিক্ষা দিচ্ছেন নিজে আচরণ ক'রে। 'হরি আপনি এসে, যোগিবেশে, করিলে নামসংকীর্তন।'

গিরিশ ঠাকুরকে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করছেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে। মনে হয় যেন ঠাকুরের একটু অনিচ্ছা ছিল, তাই বললেন, 'রাত হবে না?' গিরিশ জানালেন 'না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমার আজ থিয়েটারে যেতে হবে। তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।' ভাবটা হচ্ছে—গিরিশের কথা ঠাকুর উপেক্ষা করতে পারেন না, নিমন্ত্রণ করেছেন, গিরিশ থাকুন, আর না থাকুন, যেতেই হবে। বলরামও ঠাকুরের খাবার প্রস্তুত করেছেন। ঠাকুর তাঁকে খাবার পাঠিয়ে দিতে বলছেন, বলরামের অন্ন তিনি ভালবাসেন, এটি বোঝাবার জন্য। গিরিশের বাড়ী যাবেন, দোতলা থেকে নীচে নামতে নামতে ভগবদ্ভাবে বিভোর। ঠাকুরের এই ভাবগুলি ভক্তেরা বিশেষভাবে লক্ষ্য

করতেন। ঠাকুর ভাবে বিভোর, কারণ গিরিশ ভক্ত ; ভক্তকে মনে হওয়ায় ভগবদ্ভাবে বিভোর হ'য়ে গেলেন। চলেছেন যেন মাতাল! এমনিতে ঠাকুর বেশী চলতে পারতেন না। কোথাও যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়ীতে (তখন প্রচলিত ছিল) যেতেন। বলরামের বাড়ী থেকে গিরিশের বাড়ী খুব কাছে। ঠাকুর এত তাড়াতাড়ি চলেছেন যে অপরে তাঁর সঙ্গে যেতে পারছেন না। একাগ্রতার ফলে তাঁর মনে যখন যে চিন্তাটি উঠত, সেই একটি চিন্তাই তখন থাকত। কোনও কাজ 'করছি, করব, হচ্ছে, হবে'—এ ভাব ঠাকুর সহ্য করতে পারতেন না। এখনই, এই মুহূর্তে ক'রতে হবে—এই ছিল তাঁর ভাব। তাঁর সমস্ত জীবনে সব কাজ এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে চিন্তা করতেন, তার জন্য সমস্ত মন এত ব্যাকুল হ'য়ে থাকত যে, অন্য চিন্তা সেখানে প্রবেশ করতে পারত না। গিরিশের বাড়ী যাবেন, সেই চিন্তা তাঁর মনে প্রধান, তখন আর অন্য চিন্তা তাঁর মনে স্থান পাচ্ছে না, তাই এত তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলেছেন!

সেই ভাবাবস্থায় নরেন্দ্রকে দেখলেন ; কথা বলতে পারলেন না। পরে ভাব অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হ'লে বললেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।" প্রতিটি অক্ষর করুণামাখা! তারপর চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা কথা—এই একটি (দেহী ?) ও একটি (জগৎ ?)।" মাস্টারমশায় এর ব্যাখ্যা করেননি। বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে বলছেন 'এই' একটি মানে কি দেহী ? এবং 'ও' একটি মানে কি জগৎ ? জীব ও জগৎ ? চৈতন্য এবং চৈতন্যের যে বাহ্য প্রকাশ—জীব-জগৎ ? মাস্টারমশায় ভাবছেন, "ভাবে এসব কি দেখিতেছিলেন ? তিনিই জানেন, অবাক্ হ'য়ে কি দেখিলেন!" ঠাকুর একথাটি বললেন, মনে হ'ল যেন বেদবাক্য —যেন দৈববাণী। মাস্টারমশায় বলছেন, "যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে

গিয়াছি ও অবাক্ হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটি-দুটি ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।"

নিত্যগোপাল

ঠাকুর গিরিশের দরজায় এসে উপস্থিত। গিরিশ দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করছিলেন। ঠাকুর নিকটে এলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন এবং ভক্তসঙ্গে ঠাকুরকে দোতলার বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। আসন গ্রহণ করতে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন একখানা খবরের কাগজ প'ড়ে রয়েছে। তাঁর ইঙ্গিতে সেটি স্থানান্তরিত করা হ'ল। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা আছে, তাই তাঁর বিতৃষ্ণা; পরনিন্দা পরচর্চা করা আছে, তাই অপবিত্র। কাগজটি সরাবার পর ঠাকুর আসন গ্রহণ করলেন। নিত্যগোপাল প্রণাম করলেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে?" (অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাস্‌না?) নিত্যগোপাল বলছেন, যান নি—কারণ শরীর খারাপ, ব্যথা (তাঁর অম্বলের ব্যথা হ'ত)। ঠাকুরের প্রশ্ন, "কেমন আছিস?" নিত্যগোপাল বলছেন, "ভাল নয়।" ঠাকুর বললেন, "দুই-এক গ্রাম নীচে থাকিস।" অত চড়া থাকলে শরীর থাকবে না। ভাব প্রবল হ'লে সাধারণ দেহ তাকে ধারণ করতে পারবে না। ঠাকুর বলতেন, শ্রীমতী, শ্রীচৈতন্য এঁদের মহাভাব হ'ত। অবতার পুরুষেরা এই মহাভাবটি ধারণ করতে সক্ষম হন। মহাভাবের বর্ণনা নিজের অনুভবের মধ্য দিয়ে ঠাকুর বলছেন, 'কি রকম জানিস? ছোট একটা পুকুরে দশটা হাতি নেমে ওথাল পাথাল ক'রে দেয়।' সাধারণ মানুষের শরীর সে বেগ ধারণ করতে না পেরে ভেঙে যায়। অবতারের দেহ অন্য ধাতুতে গড়া, তাতে ভাবের আবেগ ধারণ করা সম্ভব। এ জিনিসটি আমাদের কাছে অকল্পনীয়। কারণ আমাদের দেহে স্থূল অনুভূতি হয় ব'লে ঐগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না।

সূক্ষ্ম অনুভূতির তীব্রতার কোনও ধারণা আমাদের হয় না। অসাধারণ তীব্র সে অনুভূতি। বাস্তব জগতে দেখা যায়, প্রবল শোকে অভিভূত হ'লে মানুষের দেহ সেই শোকের বেগ ধারণ করতে পারে না। যেমন দুঃখ, তেমনই সুখ সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। ভগবদ্-আনন্দে যে বিপুল সুখ বা ভগবদ্-বিরহে যে বিপুল দুঃখ হয় শুদ্ধ-সত্ত্ব ভক্তদেহ না হ'লে সে তীব্র আবেগ ধারণ করা অসম্ভব। তাই ঠাকুর নিত্যগোপালকে দু-এক গ্রাম নীচে থাকতে বললেন। নিত্য-গোপাল উত্তরে জানালেন, তারক সঙ্গে থাকে কিন্তু তাকেও সময়ে সময়ে তার ভাল লাগে না। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, "ন্যাংটা ব'লত, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেত; গণেশগর্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য হ'য়ে গিছলো।" সঙ্গীর শরীর যাবার পর সাধুটি অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলেন। তারপর থেকে অন্যের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগত না। 'গণেশ গর্জী' শব্দটি কি অর্থে ঠাকুর প্রয়োগ করেছেন, তা বোঝা যায় না। অন্য কোথাও শব্দটির প্রয়োগ নেই। পূর্বাপর দেখলে মনে হয়, দুনিয়াকে উপেক্ষা ক'রে নিঃসঙ্গ ভাবে হাতীর মতো গর্জন করতে করতে তিনি চলে যেতেন। এই কারো জন্য অপেক্ষা না রাখা জ্ঞানীর লক্ষণ। অনপেক্ষ অর্থাৎ কোনও বস্তু বা ব্যক্তির অপেক্ষা না রাখা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কারো সঙ্গে যেন সম্বন্ধ নেই।

'তুই এসেছিস্ ? আমিও এসেছি'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঠকুরের ভাবান্তর হ'ল। কি ভাবে অবাক্ হ'য়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বলছেন, "তুই এসেছিস্ ? আমিও এসেছি।" মাস্টারমশায় বলছেন, 'এ কথা কে বুঝিবে ? এই কি দেব-ভাষা ?' এ কথাটির কোন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা তিনি করেন নি। আমরা ব্যাখ্যা করতে গেলে নিজেদের মনোভাব আরোপ করা হবে, তাতে ভুল হবে।

এটা কি এই ভাবের কথা যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একা নন, তাঁর পার্ষদদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন! তাই বললেন, "তুই এসেছিস? আমিও এসেছি।" অন্যত্র ঠাকুর বলেছেন, 'কলমীর দল একটিকে টানলে সব দলটি আসে।'

ঠাকুরের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে, (লীলাপ্রসঙ্গে আছে) অখণ্ডের ঘরে সপ্তর্ষি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেখানে একটি দেবশিশু দুটি কোমল বাহু দিয়ে নর-ঋষির গলা জড়িয়ে ধরেছেন। সেই স্পর্শে ঋষি চোখ চাইলেন। তখন দেবশিশু বলছেন, 'আমি যাচ্ছি, তোমাকেও যেতে হবে।' ঋষি সে কথা শুনে একটু হাসলেন। পরক্ষণে আবার চক্ষুমুদ্রিত ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন। ভাব মনে হচ্ছে এই, (এর ব্যাখ্যা লীলাপ্রসঙ্গকার করেন নি) ঠাকুর নিজে দেবশিশু, জগৎ-কল্যাণের জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসছেন। স্বামীজীকে তাঁর কর্মের সহকারীরূপে আসতে হবে, তাই তিনি নর-ঋষিকে এ-কথা বলছেন। এই দেবশিশুটির বর্ণনা লীলাপ্রসঙ্গকার অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় দিয়েছেন।

অখণ্ডের ঘরের খানিকটা জমে একটি শিশুর আকারে পরিণত হয়েছে। কথাটি সাধারণের বুদ্ধির অতীত। দেবশিশু ধ্যানমগ্ন ঋষিকে যাবার জন্য বলায় ঋষি সম্মতিসূচক হেসে ধ্যানমগ্ন হলেন। ভাব এই, তোমার এই দুর্বার আকর্ষণ কে উপেক্ষা করবে? দেবশিশুর দুর্বার আকর্ষণ ধ্যান-মগ্ন ঋষিরও ধ্যান ভঙ্গ করে। সমাধির গভীর আনন্দ ত্যাগ ক'রে দেবশিশুর অনুগমন করতে হয়। বলছেন, আমি যাচ্ছি, তুমিও এসো। প্রশ্ন নেই, যাবে কি না। ছোট শিশুরা যেমন আব্দার করে— সেইরকম। সেই আব্দারের বিরুদ্ধে তর্ক করার উপায় নেই, যা বলছে শুনতে হবে। দেবশিশুর এ প্রেমের আদেশ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ঋষি। প্রেমের স্পর্শেই তাঁর ধ্যানভঙ্গ হ'ল। পরে আবার ধ্যানস্থ হলেন। এই

কলমীর দল, তিনি যখনই আসেন সঙ্গে আনেন। তাদেরই লক্ষ্য ক'রে বলছেন, "তুই এসেছিস্? আমিও এসেছি।" অভিপ্রায় এই, এখন আবার নতুন ক'রে একটা খেলা চলবে, যতদিন না স্থূল শরীর ত্যাগ করেন।

মাস্টারমশায় বলছেন যে, একথা কে বুঝবে? এই কি দেবভাষা? দেবভাষা অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধির অতীত। আমাদের অনুভূতি দিয়ে এর অর্থ খুঁজে পাব না, যাঁরা 'এই অনুভূতি'র স্তরে বাস করেন, মাত্র তাঁরাই এর অর্থ বুঝবেন। অপরে কল্পনার জাল বুনে চলে শুধু। কোনটা ঠিক হয়, আবার কোনটা বা ভুল হয়। 'শ্রীম' এই কথাটিরও 'এই একটি, ও একটি'—এ কথারও কোন ব্যাখ্যা করলেন না।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে দুটি জিনিস পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য। এ দুটিকে তিনি মিশিয়ে ফেলেন না। দ্রষ্টাকে কেবল দ্রষ্টারূপে এবং দৃশ্যকে কেবল দৃশ্যরূপে দেখেন। তা হ'লে একথাটির সঙ্গে খানিকটা মিল আসে, 'এই একটি' অর্থাৎ দ্রষ্টা একটি, এবং 'ও একটি' অর্থাৎ দৃশ্য একটি; এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্। জগতে যতক্ষণ ব্যবহার চলে, ততক্ষণ দুটিকে মিশিয়ে ব্যবহার হয়। সেই মিশ্রণের সীমাকে যেন অতিক্রম ক'রে ঠাকুর বলছেন, "এই একটি, ও একটি"—দুয়ের সেখানে পৃথক্করণ হ'য়ে গিয়েছে, দুটি মিশ্রিতরূপে প্রতীত হচ্ছে না—এ এক অর্থে হ'তে পারে।

আবার ঠাকুর যেখানে বলছেন 'তিনিই সব হয়েছেন'—সেখানে এই ভাব মনে হয়, যেন একমাত্র তাঁকেই দেখছেন। সর্বত্র তিনি এমন ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছেন যে, বৈচিত্র্যময় জগতে তাঁর থেকে পৃথক্ সত্তা কিছু দেখছেন না।

আর একটি অবস্থা আছে, যেখানে দুটি আর দুটি নেই। যেখানে বৈচিত্র্য নেই,—যেখানে সব দৃশ্যের বিলুপ্তি। একমাত্র যা ছিল, তাই আছে—তাকে দ্রষ্টাও বলা চলে না। যেখানে দৃশ্য নেই, সেখানে দ্রষ্টাও নেই। তবু আমরা সেই ব্যবহারের অতীত অব্যবহার্য যে তত্ত্ব, তাকে বোঝাতে গিয়ে বলি তিনি নিত্য দ্রষ্টা, তখন তিনি দৃশ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন না। এভাবে আমরা বুঝি এবং বোঝবার জন্য বলি, জগতের অনুভবের ভিতর থেকে দুটিকে পৃথক্ ক'রে ফেলতে—একটি দ্রষ্টা আর একটি দৃশ্য। একটি তত্ত্ব, অন্যটি তার উপর আরোপিত। পৃথক্ হ'লে একমাত্র শুদ্ধতত্ত্ব যা, তাই অবশিষ্ট থাকে। সে তত্ত্বের সঙ্গে আর কোনো আরোপিত বস্তুর অনুভব হয় না। ঠাকুর যখন বলছেন, 'এই একটি, ও একটি,' তখন যেন জগৎকে সেই এক অদ্বয় তত্ত্ব শেখাবার জন্য তিনি এসেছেন। তাই পৃথক্করণের নির্দেশ দিয়ে বলছেন, যেন ব্রহ্ম থেকে এই জগৎকে একেবারে পৃথক ক'রে দাও—একটি আত্মা, আর বাকি সব অনাত্মা। এই দুটিকে যখন সম্পূর্ণ আলাদা করা যায়, তার অব্যবহিত পরেই হয় ব্রহ্মজ্ঞান।

পনের

কথামৃত—১।১৪।৭

গিরিশ-নরেন্দ্র-তর্ক

গিরিশগৃহে ভক্তপরিবৃত হ'য়ে ঠাকুর ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করছেন। "নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরিশের জলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানব-দেহ ধারণ ক'রে মর্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে, এ-সম্বন্ধে দু-জনের বিচার হয়।" তিনি দু-জনের সঙ্গে তর্ক লাগিয়ে দিলেন এবং মাঝে মাঝে নিজেও মন্তব্য করছেন। নরেন্দ্র অবতারবাদ খণ্ডন ক'রে বলছেন, "ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।" ঠাকুর নরেন্দ্রকে সমর্থন ক'রে বলছেন, "ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ।"

এই কথাটি গূঢ় অর্থবোধক। সর্বত্র একই ব্রহ্মের প্রকাশ, কিন্তু সব মানুষ সমান নয়—কারো শক্তি বেশী, কারো কম। বৈষম্য এখানে প্রত্যক্ষ। বালিও ব্রহ্ম, তিলও ব্রহ্ম, বালি পিষলে কি তেল বেরবে? ব্রহ্ম অনন্ত অবিভাজ্য, কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে প্রকাশের তারতম্য থাকে। এ পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম সর্বত্র থাকলেও তাঁর অভিব্যক্তি সর্বত্র সমান নয়।

রাম বলছেন, 'এ-সব মিছে তর্কে কি হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত-ভাবে) "না, না, ওর একটা মানে আছে।" অর্থাৎ তিনি বিচার

চাইছেন। গিরিশের মতঃ অবতার দেহ ধারণ ক'রে আসেন। কিন্তু নরেন্দ্র ঈশ্বরকে বাক্যমন ও বুদ্ধির অগোচর বলেন। ঠাকুর বলছেন যে, "তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।...ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মার দ্বারা শুদ্ধআত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।" এই হ'ল স্বরূপেতে অবস্থান।

গিরিশ নরেন্দ্রকে বলছেন, "মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দেবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন।" ভাব হচ্ছে, ভগবান অনন্ত। সান্ত মানুষ তার সীমিত বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যদি কেউ পথ দেখিয়ে না দিত, তা সম্ভব হ'ত না। এই সীমাকে যে অতিক্রম ক'রে যাওয়া যায়, যিনি নিজের জীবনে তা দেখিয়ে দেন, ব'লে দেন, 'ঐ দেখ্ তোর বাড়ী'—তিনিই অবতার। তাঁর মধ্যে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ হয় ব'লে মানবীয় সীমার বাইরেটা তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন। বাইবেলে বলা হয়—Original sin—গোড়া থেকেই মানুষের মধ্যে অপূর্ণতা, পাপ বা ত্রুটি রয়েছে। তা থেকে সে নিজে মুক্ত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না যীশুর মতো কেউ মানবদেহ ধারণ ক'রে এসে পথ দেখিয়ে দেন। ঠাকুর এই ভাব আরো স্পষ্ট ক'রে বলছেন। অবতার সীমিত মানবদেহ-ধারী হ'য়ে এলেও সাধারণ মানব নন। তাঁর অসাধারণ শক্তি দিয়ে তিনি অন্যকে মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারেন। অন্তর্যামী-রূপে তিনি সর্বদা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, পথনির্দেশ করেন। আমাদের কলুষিত দৃষ্টি বা মন দিয়ে অন্তরের সে নির্দেশ বুঝতে পারি না। তাই অবতার এসে স্বীয় জীবন ও আচরণের ভিতর দিয়ে সকলের কাছে সেই তত্ত্ব বুঝিয়ে দেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।" নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন,

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি? ঠাকুর বলছেন, "রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।" ঠাকুর এখানে কূট যুক্তি তর্ক বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সার কথাটি বললেন। তিনি বলছেন, "যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা।" বেলটির ওজন কত জানতে হ'লে শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? "খোলা বিচি, শাঁস সব এক-সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বিচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ ব'লে বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখে,—যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বিচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, তারই বিচি, যা থেকে ব্রহ্ম ব'লছ তাই থেকেই জীব-জগৎ। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশেষ্টাদ্বৈতবাদ।"

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তত্ত্বতঃ অদ্বৈতবাদ হলেও তার ভিতর স্বগতভেদ স্বীকার করা হয়। স্বগতভেদ অর্থাৎ নিজের মধ্যেই ভেদ। যেমন একটি গাছ—তার গুঁড়ি, ডালপালা, ফুল, ফল, পাতা আছে। এগুলি গাছেরই অংশ কিন্তু পরস্পর ভিন্ন। গুঁড়িটা ডাল নয়, ডালটা পাতা বা পাতাটা ফুল ফল নয়; অথচ সব মিলিয়ে গাছ। গাছ বলতে যেমন সমস্তকে বোঝায়, তেমনি ব্রহ্ম অখণ্ড সর্বরূপ—বেদান্তের ভিতর এই দুয়েরই সমর্থক শ্রুতি আছে। বেদ বলছেন, 'সর্বকামঃ সর্বরসঃ সর্বগন্ধঃ' তিনি সর্বরূপ। আবার বলছেন, 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্, তথাঽরসম্'—এইভাবে নেতি, নেতি ক'রে যা ব্রহ্ম নয়, তাকে বাদ দিয়েই ব্রহ্ম বস্তুতে পৌঁছতে হয়। তারপর দেখা যায়, যা বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—যা

কিছু দেখছি, সব ব্রহ্ম – বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এটিকে তাঁর সমর্থক শ্রুতি বলেন।

শ্রুতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা

অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈতবাদ—সকলেরই সমর্থক শ্রুতি আছে। কারণ এইসব বাদীরাই শ্রুতিকে মেনেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার একমাত্র নাস্তিক ছাডা আস্তিক্যবাদীরা সকলেই বেদকে মেনেছে। এমনকি যে মতে ঈশ্বরকে না মেনে বেদকে মানা হয়েছে, তাকেও আস্তিক্যবাদ বলা হয়েছে। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হলেও বেদ মানে বলে 'আস্তিক'। তেমনি মীমাংসকের একটি মতে ঈশ্বর মানে না, তারাও আস্তিকরূপে কথিত। যোগের একটি মতে ঈশ্বরকে প্রমাণ করার যুক্তি নেই—'ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ প্রমাণাভাবাৎ' -প্রমাণ নেই ব'লে ঈশ্বর অসিদ্ধ। তবু তাকে আস্তিক দর্শন বলা হয়, নাস্তিক নয়। বেদ না মানলেই নাস্তিক। বেদকে এঁরা প্রমাণ ব'লে মানেন, কিন্তু স্ব স্ব মতানুসারে বেদের ব্যাখ্যা করেন। বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও পরস্পরের মতকে ভিন্ন ব'লে দেখানো হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, বেদ অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে এবং দ্বৈতবাদী বলেন দ্বৈতবাদকে। বেদের ভিতর তাদের সমর্থক শ্রুতি খুঁজে পেয়ে, তাঁরা স্বমতকে প্রাধান্য দিয়ে, অন্য অর্থবাচক বাক্যগুলিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। সকলকেই তাই করতে হয়।

'তাঁর ইতি করা যায় না'

ঠাকুর একটি নতুন মত বলছেন—সবগুলিই পথ, সব মতবাদ সত্য। অর্থাৎ সাধনরূপে অবলম্বিত হ'লে যা আমাদের পরমতত্ত্বে পৌঁছে দেয়, তাই সত্য। ইংরেজীতে বলতে গেলে ঠাকুরের এটি ব্যাবহারিক দৃষ্টি (pragmatic view)। ঠাকুরের মতে: এ সবই পথ, যা দিয়ে তোমরা

চরম অনুভূতিতে পৌঁছচ্ছ, মনে ক'রছ এইটিই চরম অনুভূতি, অন্যগুলি নয়—সে কথা তোমাকে কে ব'লল? তিনি সাকার, নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারের পারে। তিনি সগুণ, নির্গুণ, আরো কত কি। ঠাকুর বলছেন,—'ঈশ্বর-বস্তুর কখনও ইতি করতে নেই। তিনি এ হ'তেই পারেন আর এই হ'তে পারেন না, তোমাদের এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে এ-রকম নির্ণয় ক'রো না।' মহিম্ন স্তোত্রে আছে—'ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি' (২৬)—আমরা কিন্তু জগতে এমন কোনো তত্ত্ব জানি না, যা তুমি নও। তুমি সব হ'তে পারো। তাই ঠাকুর 'ইতি' না করার উপর জোর দিয়েছেন। আমরা যদি বলি, তিনি আসলে অদ্বৈত-বাদী, তবু অন্যান্য বাদকে অংশতঃ স্বীকার করেছেন, তা যথার্থ নয়। তিনি কোনও তত্ত্বকে আংশিকভাবে নয়, পূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। এ অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, অন্যান্য মতকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মেনে নেওয়া নয়। এ হ'ল সর্বমতকে সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি। মাণ্ডূক্যকারিকাতে আছে: স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্। পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে—নিজের নিজের সিদ্ধান্তের যে প্রণালী তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হ'য়ে দ্বৈতবাদীরা পরস্পর বিরোধ ক'রে বলে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। দ্বৈতবাদীর পর্যায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত, শিবাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আরো কত বাদ পড়ে। অদ্বৈত আর কেবলাদ্বৈত ছাড়া সবই দ্বৈতের পর্যায়ভুক্ত। কারণ তাঁরা একাধিক তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন। একটির বেশি তত্ত্বকে স্বীকার করলেই দ্বৈত হয়। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত কোনমতে দ্বৈতের সঙ্গে আপস করে না—'অয়ং ন বিরুধ্যতে'। এ মীমাংসা আদৌ উদার নয়। তাঁদের দৃষ্টিতে সব মতই মিথ্যা, সুতরাং তাঁরা কারো সঙ্গে বিবাদ করেন না। মিথ্যার সঙ্গে কি বিরোধ করবেন? এটি উদার মীমাংসা হ'ল না।

অথবা যদি বলি, শ্রীভগবানকে অনুভব করার পর তিনি দয়া ক'রে তাকে অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত করলে সে অদ্বৈতবাদী হবে, এতে তো মীমাংসা হচ্ছে না। কারণ তাতে বোঝানো হচ্ছে যে অদ্বৈতবাদই সিদ্ধান্ত। দ্বৈতবাদ—পথে যেমন বিশ্রামের জায়গা সরাইখানা থাকে, সেই রকম।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সগুণ বা নির্গুণ যে ভাবেই হোক, ঈশ্বরকেই আস্বাদন করা হচ্ছে। সগুণ যিনি, তিনিই নির্গুণ। সগুণ থেকে নির্গুণে যেতেই হবে এমন নয়; বরং তিনি তার বিপরীতক্রম বলেছেন, নির্গুণ থেকেও সগুণে আসতে পারা যায়; কোনটি শেষ কথা, তা বলা যায় না। কারণ ঈশ্বরের শেষ নেই; তাঁর অনন্ত প্রকার। যদিও এক জায়গায় ঠাকুর অদ্বৈতজ্ঞানকে শেষ কথা বলেছেন, তবু আরো বলেছেন যে অদ্বৈতজ্ঞানের পরেও কিছু থাকে। অ-জ্ঞানী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী—কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়ে বলবান্ হয়েছে। কেউ ব্রহ্মতত্ত্ব শুনেছে, কেউ অনুভব করেছে; কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ খেয়ে বলবান্ হয়েছে; সেই রকম জীবনে তাঁকে ওতপ্রোত অনুভব ক'রে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি স্তর—ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ—একই তত্ত্ব, তার অনন্ত দিক। একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা—ঠাকুর তা বলছেন না।

বাইবেলে যেমন আছে, ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ-পথ অনেক, কিন্তু প্রবেশ করলে সেখানে এক ভগবান্। এক ভগবান্, সকলের কাছে এক-রকম ভাবে প্রতীত হন না। কারো কাছে নির্গুণ, কারো কাছে নানাগুণসম্পন্ন। কারো কাছে অসি, কারো কাছে বাঁশি, কারো কাছে আরও কত কি নিয়ে তিনি দেখা দেন। অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর স্বরূপ, কোনটাকে বাদ না দিয়ে সমভাবে সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করাই ঠাকুরের মত।

ঠাকুরের এই বিশেষ সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হই। নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের কি সিদ্ধান্ত নেবেন! অথচ বিভিন্ন বিবদমান সিদ্ধান্তের সকল বিবাদের অবসান ঘটাতে পারে, এটি এমনই এক সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর বিচিত্র, এই বিচিত্র রূপেই তাঁকে স্বীকার করা হচ্ছে। 'তিনি এই, আর এই হ'তে পারেন না'—একথা যদি কেউ বলেন, তা হ'লে তাঁর অভিজ্ঞতা সীমিত। তিনি এক ভাবেই ভগবানকে আস্বাদন করেছেন, অন্যভাবে করেননি।

ঠাকুর বহুরূপীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সেটাকে দেখে এসে কেউ বলে লাল, কেউ হলুদ, কেউ নীল, কেউ বা বলে সবুজ—ঝগড়া চলছে। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা সত্য, কিন্তু সীমিত। যে গাছতলায় থাকে, সে গিরগিটিকে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা দেখে; আবার কখনো দেখে কোন রংই নেই। সে-ই বোঝাতে পারে, কারণ অন্যদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা সীমিত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেটিকে বহুরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তিনি জানেন এই বহুরূপীকে। ভগবানের বহুরূপত্বকে খর্ব না করাই—তাঁর একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

স্ব স্ব মতের প্রাধান্য স্থাপন

অদ্বৈত বেদান্তে দৃষ্টিকে রঞ্জিত ক'রে ঠাকুরের সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করলে আমরা তা খণ্ডিত ক'রে ফেলব। অদ্বৈতের যুক্তি অনুসারে অদ্বৈত সত্য, আর সব মিথ্যা। কারণ তাদের যুক্তি তাদের অনুভবের উপর আধারিত। অনুভব যুক্তির আধার, কিন্তু একটি অনুভবই কি যথেষ্ট? যার ঈশ্বরের বহুরূপত্বের অনুভব নেই, সে কি ক'রে যুক্তি দিয়ে তাঁর বহুরূপ বুঝবে? দ্বৈতবাদী বলবেন, অদ্বৈত শেষ নয়। যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদিতদপ্যস্য তনুভাঃ—উপনিষদে যে অদ্বৈতকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, তা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। ভয়ানক কথা—শুরু হ'ল বিবাদ। অভিজ্ঞতা

অনুসারে যুক্তি দিয়ে কেউ ব্রহ্ম, কেউ শ্রীকৃষ্ণ ব'লে অনুভব করেছেন। চরমতত্ত্ব কি ক'রে প্রমাণিত হবে? তর্ক বা লড়াই ক'রে? যাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে লড়াই করছেন, তাঁদের এক বিন্দু অনুভব নেই। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি, তা কে বলবে? যুক্তি যতদূর যায়, তাকে ততদূর নিয়ে যাওয়া ভাল। অন্ধের গোলাঙ্গুল ধ'রে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার মতো—যখন কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে যেতে গা ছ'ড়ে রক্তারক্তি হচ্ছে, তখন অন্ধ ভাবছে বৈকুণ্ঠে চলেছি—এটি অনুসরণীয় নয়। যুক্তি এজন্য অবশ্য অবলম্বনীয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার যুক্তি আমার অনুভবের উপর নির্ভর করে, অন্যের অনুভবের উপর নয়। অবশ্য অনুভবকেও শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়। তা না হ'লে পাগলের অনুভবও নিতে হয়। একটি সুন্দর কথা আছে—প্রকৃতির পারে যে বস্তু, যা চিন্তার অগোচর, তাকে চিন্তা বা যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা বা বিচার করতে যেও না। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ'—যে সব বিষয় চিন্তার অগোচর, তাদের তর্কের দ্বারা বুঝতে যেও না। সুতরাং বেদের অর্থ নিয়ে বিবাদ চলছে। নানা জন নানা ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতঃ এর মধ্য দিয়ে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না।

ঠাকুরের সেই গল্পটি—বর্ধমানের রাজসভায় 'শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?'—এ নিয়ে তুমুল তর্ক হয়েছিল, পদ্মলোচনের কাছে মীমাংসা চাওয়া হ'ল। তিনি বললেন, 'শুধু আমি নই, আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও শিবকেও দেখেনি, বিষ্ণুকেও দেখেনি। আমি কি ক'রে ব'লব, কে বড়?'

ভগবানের স্বরূপ নিয়ে যাঁরা তর্ক করেন, তাঁদের একথা মনে রাখা দরকার। পদ্মলোচন বললেন যে, শাস্ত্র বিচার করলে দেখা যায়, শৈবশাস্ত্রে শিবকে এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় বলে। তন্ত্রশাস্ত্র মতে শিব

বিষ্ণু আদ্যাশক্তির দুটি সন্তান। সর্বনাশ! যা সত্য ব'লে আমাদের এতদিনের কল্পনা, সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যে ভাবটি যার ভাল লাগে, সেই ভাব আশ্রয় ক'রে সে তাঁকে জানুক। চরম গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে বুঝবে—অন্যান্য পথও সেইখানেই পৌঁছচ্ছে। পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও পরম লক্ষ্য যে ভগবান, তাঁর বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তিনি বিচিত্র স্বরূপে বর্তমান। যার যেমন ভাব, তার সেরকম উপলব্ধি। একই গামলায় বিভিন্ন রংয়ের মতো, যার যেমন পছন্দ, সে সেখান থেকে সেই রঙে কাপড় ছোপাবে। তেমনি সেই পরম তত্ত্বকে যে যেমন রূপে চায়, সেই রূপে তার কাছে তিনি প্রতীত হন। সব রূপই তিনি—এটি ঠাকুরের কথা। কারো প্রতি অবজ্ঞা দেখানো নেই। সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে রুচি অনুসারে, উপলব্ধি করছে, বিভিন্ন রূপেই হোক কিংবা অরূপেই হোক।

ঠাকুর বলছেন, অরূপেও তাঁর দর্শন হয়—এটি সম্পূর্ণ নতুন কথা। এর আগে কোন আচার্য একথা বলেন নি। গীতায় ভগবান বলছেন, 'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'—(৪।১১) সকলে সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে। সেই আমি যে কে, এই নিয়ে খুব ঝগড়া। আমি কি কেবল দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ, গোলকবিহারী, কি বৈকুণ্ঠবিহারী? তিনি কি নারায়ণ, নারায়ণ হ'লে কোন নারায়ণ? শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী? না, গদাপদ্মশঙ্খচক্রধারী? না, শঙ্খগদাচক্রপদ্মধারী। এই রকম বিন্যাস ও সমবায় (permutation ও combination) আছে।

ঠাকুরের সর্বগ্রাহী ভাব

আমরা যে যেভাবে তাঁকে চাই—অরূপ বা বহুরূপ—তার কাছে তিনি তাই। উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে ঠাকুরের এই দৃষ্টি অদ্ভুত-ভাবে মিলে যায়। এটি এখানে আলোচ্য এই কারণে যে অনেক

সময় তাঁর আদর্শটি বুঝতে আমাদের সংশয় হয়—তিনি কি বলতে চাইছেন।

ঠাকুর বলছেন, কোন জায়গায় ভক্তিহিমে সমুদ্র জ'মে যায়, আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে গ'লে যায়। আরো সুন্দর কথা বলছেন, কোন কোন জায়গায় নাকি বরফ কখন গলে না। সুতরাং তাঁর এই রূপগুলি অরূপে পৌঁছনর পথে যে একটি দর্শন মাত্র—তা নয়। যদি কেউ ভগবানের নিত্য স্বরূপকে ধ'রে থাকে, তাহলে সে যে তাঁকে লাভ করে না বা অল্প লাভ করে—তা নয়। ব্রহ্ম সমুদ্র, তা অরূপ বা স্বরূপ যাই হোক। গঙ্গাকে স্পর্শ করতে গেলে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না, গঙ্গার যে কোন জায়গা ছুঁলেই হয়।

আমাদের বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য ভাবি, আমি যেভাবে উপলব্ধি করছি, অপরে সেভাবে উপলব্ধি করেনি। আমাদের অজ্ঞতা দেখে তিনি হাসেন, ভাবেন এরা আমাকে সবটা বুঝে ফেলেছে! অথচ দ্বৈত, অদ্বৈত সকলে বলে, তাঁকে কেউ বুঝে ফেলতে পারেনি।

প্রত্যেকে নিজের ভাবে অপরকে আনার চেষ্টা করে। শ্রীরামকৃষ্ণই ইতিহাসে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যিনি সকলের সঙ্গে সমানভাবে ঈশ্বরকে আস্বাদন করতে পেরেছেন। অন্য ধর্মে কোথাও কোথাও উদারতা দেখা গেলেও সে উদারতা সীমিত। কিন্তু ঠাকুর তাঁর সর্বাবগ্রাহী অনুভূতির মধ্যে এমনভাবে সকলকে আবৃত ক'রে নেন যে, তার বাইরে কেউ থাকে না।

এটি বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। ছোট-বড, উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী-ভক্ত সকলেই এক ব্রহ্ম-সমুদ্রে অমৃত পান ক'রে অমর হচ্ছে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে কেউ জেনে ফেলেনি। চিনির পাহাড়ের এক দানা চিনি খেয়ে পেট ভ'রে যাবার পর, আর এক দানা মুখে ক'রে নিয়ে যেতে যেতে পিঁপড়ে ভাবছে—এইবার পাহাড়টাকে নিয়ে যাব! পরিস্থিতি

এইরকম হাস্যকর হয়, যদি কেউ মনে করেন তিনি ব্রহ্ম-সমুদ্র সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করেছেন।

শাস্ত্র বলছেন, তুমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে কিছুই বোঝনি। তিনি অনন্ত, সর্বপ্রকারে অনন্ত। ঠাকুর বার বার বলছেন, এই অনন্তের ইতি ক'রো না। শিবমহিম্নস্তোত্রে মহাদেবের ক্ষিতি জল ইত্যাদি অষ্টমূর্তির উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে, যাঁরা বুদ্ধিমান্ তাঁরা এ-রকম বলুন, আমরা জানি না তুমি কি হ'তে পার না। ঠাকুর এই রকম অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়ে কাকেও ছোট বড় না ক'রে, একদেশিতা দূর ক'রে, ভিতরের তত্ত্বটুকু বুঝবার চেষ্টা করতে বলছেন। আর তা না পারলে, অন্যের ভাব তুচ্ছ না ক'রে বলা ভাল যে, ঐ ভাব আমার জানা নেই। কোন ভাব অনুভব না ক'রে তাকে তুচ্ছ করার অধিকার কারো নেই। দম্ভবশতঃ ভাবগুলিকে ভূয়া না ব'লে 'আমি জানি না' বললে দোষ নেই। 'বাদ দিলে কম পড়ে যাবে'—ঠাকুরের একথার আরও তাৎপর্য—তিনি বহুরূপ, এক রূপকে বাদ দিলে কম প'ড়ে যায় ব'লে, যে রূপ আমরা জানি বা না জানি ; সব নিতে হবে। ঠাকুর তাই বলছেন, 'তিনি যখন এমন, তখন আরো তিনি কত কি!' তাঁর সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে আমরা নিঃশেষিত করতে পারি না। শাস্ত্রও করেনি। শাস্ত্রমতে তাঁর অনন্ত সম্ভাবনা ; সুতরাং সেই অনন্ত সম্ভাবনাকে সম্মান ক'রে বিশেষ বিনীতভাবে এ তত্ত্বের আলোচনা করতে হয়। আমাদের এই সবজান্তা ভাবটি ঠাকুর বার বার নিন্দা করেছেন।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—এই তিনটির কথা ব'লে বিশেষ ক'রে বিশিষ্টাদ্বৈতের কথায় পরিসমাপ্তি করেছেন। নরেন্দ্রকে বলছেন "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কিনা,

জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম।" এর থেকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কথাটি এসেছে। চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট উভয়ের অদ্বৈত। অর্থাৎ, যিনি চিৎ-বিশিষ্ট তিনিই অচিৎ-বিশিষ্ট—এই রামানুজের মত। চিৎ বলতে চেতন অর্থাৎ বিভিন্ন জীব ভগবানের একটি অংশ; জড় জগৎ তাঁর আর একটি অংশ। চিৎ এবং অচিৎ যেন ভগবানের শরীর। আমার শরীরের সঙ্গে আমি যেমন অভিন্ন, তেমনি ভগবান জীব এবং জগতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন তাদের থেকে অভিন্ন হ'য়ে। তাঁরা বলেন, জীব ও জগৎ তাঁর শরীর এবং তিনি হলেন শরীরী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা একটি পরম-তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও সেই তত্ত্বের মধ্যে স্বগতভেদ তাঁরা স্বীকার ক'রে থাকেন। ভগবানের মধ্যে অন্তর্নিহিত থেকেও তাঁরা পরস্পরের থেকে ভিন্ন। এই স্বগতভেদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মানেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে Pantheism আছে। Pan মানে সর্বত্র, theos মানে ঈশ্বর, অর্থাৎ সর্বত্র ঈশ্বর। তা হলে ঈশ্বর এবং সর্ব—উভয়কে মানা হ'ল। ঈশ্বর যেমন সত্য তাঁর এই সর্বপ্রকার হওয়াও তেমনি সত্য। Pantheism কিন্তু ঈশ্বরকে জগদতিরিক্তরূপে ভাবতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলছেন, এই বিশ্বে তিনি পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তাতেই তিনি সীমিত হ'য়ে যাচ্ছেন না। এক সত্তারূপে জীবজগতে পরিব্যাপ্ত থেকেও তারও বাইরে তিনি। এইটি বিশেষ ক'রে ব্রহ্মবাদের স্বরূপ। 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' (শ্বে. উ. ৩. ১৪.)—সমস্ত ভূমিকে তিনি আবৃত ক'রে তার বাইরেও অবস্থান করছেন, আবার দশাঙ্গুলি পরিমিত হ'য়ে উপলব্ধ হচ্ছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভগবানের বহুধা বিচিত্র রূপ মানেন এবং সবগুলিকেই সত্য ব'লে স্বীকার করেন।

ভগবান্ থেকে জীব এক হিসাবে ভিন্ন, এক হিসাবে অভিন্ন। যেমন আমি, আমার দেহ; দেহে আমি থাকি অথচ অংশ-বিশেষে সীমিত থাকছি না। এই রকম কতকগুলি স্বগতভেদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে

স্বীকার করা হয়। দ্বৈতবাদী বলেন জীব ও জগৎ একেবারে ভিন্ন বস্তু। জীব জগৎ ও ঈশ্বর এগুলি নিত্য ভিন্ন বস্তু।

অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের ভিতর কোন রকম ভেদ স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এই ব্রহ্ম, পরমতত্ত্বে কোন প্রকার ভেদ নেই,—এটি অদ্বৈতবাদীর মূল কথা। অ-দ্বৈত, যা দ্বৈত নয়। অদ্বৈতবাদীরা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতিকে দ্বৈতের পর্যায়ে ফেলেন। কারণ এঁরা সকলেই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বকে মানেন। ব্রহ্মের ভিতরে স্বগতভেদ স্বীকার করা হ'লে, তাত্ত্বিক ভাবে ভেদকে স্বীকার করা হয় ব'লে এঁরা বলছেন দ্বৈতকেও মানা হয়েছে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত ছাড়া আর সবই দ্বৈত সিদ্ধান্ত।

দ্বৈতবাদী তাঁদের বিরুদ্ধে বলেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে অস্বীকার ক'রব কি ক'রে? অদ্বৈতবাদী বলেন, দৃশ্য হলেই সত্য হবে, যদি এমন কোন নিয়ম থাকত, তাহলে রজ্জু-সর্প স্থলে সর্পও সত্য হ'ত। তা যখন সত্য নয়, তখন দৃষ্ট হলেই সত্য হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। এটি তাঁদের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা আরো মারাত্মক। অদ্বৈতবাদী বলেন দৃষ্ট হলেই মিথ্যা হবে। কারণ দৃষ্ট বস্তুর সত্তা নির্ভর করে দ্রষ্টার উপর। দ্রষ্টা না থাকলে দৃশ্য থাকে না। সুতরাং দৃশ্যের সত্তা নিরপেক্ষ নয়, সাপেক্ষ; আর দ্রষ্টার সত্তা নিরপেক্ষ। যখন দ্রষ্টা বলি, তখন কিছুকে দেখছি বলেই বলি। দ্রষ্টা কি তাহলে সাপেক্ষ হ'য়ে যাচ্ছেন? তা নয়, দ্রষ্টার সামনে দৃশ্য থাকলে তিনি দেখেন, দৃশ্যের লোপ হ'লে দ্রষ্টার লোপ হবে—এমন কোন কথা নেই। সূর্য জগতের বিভিন্ন বস্তুকে প্রকাশ করছে, বস্তু না থাকলে সূর্যের লোপ হবে, এমন কল্পনা করা যায় না। সূর্য তার প্রকাশের জন্য প্রকাশ্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু তার প্রকাশের জন্য সূর্যের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দৃশ্য দ্রষ্টার অপেক্ষা রাখে, কিন্তু দ্রষ্টা দৃশ্যের অপেক্ষা

রাখে না। তাই দ্রষ্টা ছাড়া কোন কিছুরই নিরপেক্ষ সত্তা নেই। দ্রষ্টার সত্তাই একমাত্র নিরপেক্ষ অর্থাৎ যার কোন দ্বিতীয় নেই. আর সেটাই হ'ল একমাত্র বস্তু। এই হ'ল অদ্বৈতবাদীর মত। ঠাকুর এখানে শ্রুতির মত অল্প অল্প ইঙ্গিত ক'রে বিভিন্ন মতবাদগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

ষোল

কথামৃত—১।১৪।৮

গিরিশ-ভবনে ভক্তপরিবৃত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলছে। মাস্টারমশায়কে বলছেন, "আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার ক'রব? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন।" ঠাকুরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, সেখানে কি বিচার করবেন? বিচারের দ্বারা অন্যের সন্দেহের নিরসন হয়, কিন্তু যে প্রত্যক্ষ দেখছে, তার সন্দেহই আসে না। তবে চৈতন্যকে লাভ না করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। চৈতন্যকে জানা অর্থাৎ 'বোধে বোধ হওয়া' —একথা ঠাকুর অন্যত্র বলছেন। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মজ্ঞ যিনি, তিনি ব্রহ্মই। সুতরাং একজন আর একজনকে জানবে, এ-রকম প্রশ্নই আসে না। চৈতন্য যদি কখনও নিজেকে উপলব্ধি করে, চৈতন্য হয়েই করবে। অন্য উপায়ে তা পারবে না। যখনই আমরা চৈতন্যকে জানতে যাচ্ছি; তখনই অন্য বস্তুকে তার সঙ্গে মিশিয়ে বস্তুরূপে, বহির্জগৎরূপে অন্তঃকরণ বা মনোধর্মরূপে, আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরূপে জানার চেষ্টা করছি।

এভাবে শুদ্ধব্রহ্ম বা আত্মাকে জানা যায় না। সেই বস্তু হ'য়ে গেলে তবে তাকে জানা যায়; অথবা তাকে জানা আর তাই হওয়া দুটি এক। শুধু মুখে বললে হবে না যে, এই আমি দেখছি, সত্য, সত্য তদ্রূপ হ'য়ে জানতে হবে। তবেই হবে প্রকৃত জানা, যাকে আমরা চৈতন্যলাভ করা বলছি।

ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণাবলী

এই চৈতন্যলাভ স্বসংবেদ্য। আমি চৈতন্যলাভ করেছি, এ অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারি না, অপরে এ অভিজ্ঞতা বুঝবে না। নিজেকে বুঝতে হবে যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিতে লক্ষণ দেখিয়ে আর একটি কথা বললেন, "চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না; বিষয় কথা শুনলে কষ্ট হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এগুলি চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত মানুষের স্বভাব। বলাবাহুল্য, সে অবস্থা এত গভীর, এত অন্তরঙ্গ যে তাকে প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্ম যেমন অপ্রকাশ্য, ব্রহ্মজ্ঞও তেমনি নিজের ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারেন না। তবে বাইরে কতকগুলি লক্ষণ দেখে মনে করা হয়, ইনি ব্রহ্ম! সেই লক্ষণগুলি একটু একটু এখানে বলছেন। সমাধি হওয়ার অর্থ জ্ঞানেতে পূর্ণ স্থিতি। সম্যক্‌রূপে আত্মাকে ব্রহ্মে স্থাপন, বা তদ্রূপে পরিণত হওয়া, বা তদ্রূপতার উপলব্ধি হওয়া। আমাদের দৃষ্টিতে 'সমাধি'র অর্থ বাহ্যজ্ঞানলোপ। মন যখন বাহ্যবস্তু ভুলে আত্মাতে নিবিষ্ট হ'য়ে যায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এই অবস্থা সমাধির প্রথম স্তর। দেহ ভুল হ'য়ে যাওয়া। 'মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়' ঠাকুর বলছেন। মাঝে মাঝে কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরও জগতের সঙ্গে ব্যবহার হয়, তাই তাঁর জগৎকে একেবারে বিস্মৃত হওয়া চলে না।

তা হ'লে ব্যবহার হ'ত না। 'কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি' কথাগুলি ব্রহ্মজ্ঞের আচরণ দিয়ে বুঝতে হবে। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা এসব কিছুটা উপলব্ধি করেছেন। এ দৃশ্য অতিশয় দুর্লভ, ভগবৎ-কৃপা না হ'লে এ-রকম অপূর্ব জীবন সামনে দেখা যায় না।

ঠাকুরের সন্তানদের কৃপায় যখন যেটুকু তাঁদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, তা থেকে বলতে পারি, দেহ পর্যন্ত ভুল হ'য়ে যাওয়া ঠাকুরের সন্তানদের ভিতর দেখেছি—অন্য কোথাও যা দেখিনি। প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে এ বিষয়ে কিছু বলা অসুবিধাজনক, কারণ এরূপ কথা সাম্প্রদায়িক ব'লে মনে হ'তে পারে। এরূপ ব্যক্তিত্ব তাঁদের মধ্যেই সীমিত, বাইরের কারো হবে না—তা বলছি না। অন্য কোথাও দেখিনি বলার তাৎপর্য,—এ দর্শন দুর্লভ। ভারতে নানা স্থানে পর্যটন কালে নানা সাধুভক্ত-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু এই যে 'সব ভুলে যাওয়া,' আত্মবিস্মৃতি—দেহের সম্বন্ধ পর্যন্ত! এরূপ অন্যত্র দেখার সুযোগ পাইনি।

ঠাকুর এসব কথা উল্লেখ ক'রে নিজের চরিত্রের বর্ণনা করছেন, দৃষ্টান্ত দেখে সকলে যাতে বুঝতে পারে। আমরা ঠাকুরকে না দেখলেও তাঁর সন্তানদের ভিতর এইভাব প্রকাশিত হ'তে অনেক সময় দেখেছি। তাঁদের জীবন-চরিত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাও জেনেছেন কি-রকম ক'রে এই ভাবটি তাঁদের ভিতর প্রকটিত হ'ত। সর্বদা যে হ'ত তা নয়। ঠাকুরও বলছেন, মাঝে মাঝে সমস্ত বিস্মৃত হওয়া।

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) সেবক গড়গড়ায় কলকে দিয়ে নলটি হাতের কাছে রেখে যেত। তিনি বসেই আছেন, স্থির শান্ত স্থাণুর মতো, তামাক পুড়ে যাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি নেই। সেবকেরা জানতেন, তাই অতিশয় সাবধানে থাকতেন। বাহ্য প্রকৃতির প্রতিকূলতার জন্য,

মনের সেই উচ্চ ভূমি থেকে তিনি যাতে নামতে বাধ্য না হন, সেজন্য কলকের পর কলকে তামাক দেওয়া হ'ত। খেয়ালই নেই, আবার কখনো একটু হুঁশ হ'ল তো দু-একবার খেলেন। অপূর্ব এই দৃশ্য! এই দৃশ্যের একটি ছবি তোলা আছে। একজন বাইরে থেকে এসে বলছেন, 'মহারাজ তামাক খাবার বদ্ অভ্যাসটি ছাড়তে পারেননি।' তার কাছে এই মনে হ'ল, আর সেবকরা দেখেছেন তাঁর আত্মবিস্মৃত ভাব। সমাধি একেই বলে। ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের সকলের মধ্যেই এই প্রকাশ অল্পবিস্তর দেখা যেত। এর ভিতরে এতটুকু লোক-দেখানো ভাব নেই, এ ছিল তাঁদের স্ব-ভাব। ঠাকুর এই কথাই বলছেন, 'মাঝে মাঝে জগৎ ভুল হয়ে যায়।' 'কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না।'—ঠাকুর এখানে খুব সহজ সর্বজনবোধ্য ক'রে নিজের অবস্থাটি বর্ণনা করেছেন। মনোবিজ্ঞানীর মতো বিশ্লেষণ ক'রে নয়, সাদা কথায়। চৈতন্যলাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়। যাঁদের চৈতন্যলাভ হয়েছে তাঁদের এই অবস্থা হয়।

ঠাকুর মাস্টারমশায়কে বলছেন, "দেখেছি, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার—তিনি যদি তাঁর মানুষ-লীলা দেখিয়ে দেন, তা হ'লে আর বিচার ক'রতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।"

বিচার ক'রে জানা সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত জ্ঞান নয়, সন্দেহের অবকাশ থাকে। বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত ক'রে মনে যে ধারণা করার চেষ্টা করি, তারই নাম 'ধ্যান'। সেই ধ্যানের সময় ধ্যাতা আর ধ্যেয় এক হয় না। 'তিনি দেখিয়ে দেন' বলার তাৎপর্য সাক্ষাৎ অনুভূতি, সে আর এক বস্তু। এই তিনটি পর পর বললেন।

বিচার ও জ্ঞান

তারপর বলছেন, তিনি যদি তাঁর মানব-লীলা দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন—অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়, তা হ'লে আর বিচার করতে হয় না। বিচার ক'রে নয়, ধ্যান ক'রে বোঝাও আসল বোঝা নয়। "কি রকম জানো? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ ক'রে আলো হয়। সেই রকম দপ্ ক'রে আলো যদি তিনি দেন, তা হ'লে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার ক'রে কি তাঁকে জানা যায়?"

দেশলাই ঘসা, অর্থাৎ সাধন। সেই সাধন যে প্রকারেরই হ'ক। বিচার, ধ্যান-ধারণা, মনকে শুদ্ধ করার সকল প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হ'তে পারে—এই সব ক'রে জানাই সাধন। মনে রাখতে হবে, তখনো আসল জানা হয় নি। হয়তো, ধ্যানের সময় মনে মূর্তিটি ফুটে উঠেছে, কিন্তু তা দর্শন নয়। কল্পনাটি খুব দৃঢ় হওয়ার পরিণামে তাঁকে দেখা যায়, কিন্তু সে দেখা কি কোন বস্তুরূপে দেখা? 'আমি দেখছি'—এ বুদ্ধি থাকা পর্যন্ত পূর্ণ দেখা হয় নি। আর যখন তিনি দেখিয়ে দেন—এটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সেই দেশলাই ঘসতে ঘসতে হঠাৎ আলো জ্বলে যাওয়া—সাক্ষাৎ অনুভূতি। সে অনুভূতি যদি হয়, দপ্ ক'রে আলো যদি তিনি জ্বেলে দেন, অন্ধকার নিঃশেষে দূরীভূত হয়, সব সন্দেহ মিটে যায়। 'এরূপ বিচার ক'রে তাঁকে কি জানা যায়?'—ঐরূপ বিচার মানে বিচার তখনো অনুভূতিতে পরিণত হয়নি। বিচার সাধন বটে, কিন্তু বিচার-সাধন অবলম্বন করেই ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে যায় না। এটি উপায়—যা আমাদের পথ দেখিয়ে ইঙ্গিত ক'রে বলছে, এ দিকে চল। কিন্তু বস্তুলাভ করাতে পারে না।

গীতায় ভগবান বলছেন, "সকলে আমাকে মানুষ মনে ক'রে অবজ্ঞা করে, পরমতত্ত্বকে জানে না। তাদের জানার সামর্থ্য নেই, তত্ত্বকে

পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার মত অন্তঃকরণের শুদ্ধি নেই। এমন শুদ্ধি হ'লে, দর্শন হয়, সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়—অবতারকে চেনা যায়।

কালী ও ব্রহ্ম

নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলছেন, 'কই, কালীর ধ্যান তিন-চার দিন করলুম, কিছুই তো হ'ল না।' ঠাকুর তাঁকে নিরুৎসাহ না ক'রে বলছেন, "ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি ব'লে কই, কালী ব'লে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম ব'লছ, তাঁকেই কালী বলছি।"

নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নাম-লেখানো সদস্য। ব্রাহ্মসমাজের ছাপ তখনও মন থেকে মুছে যায়নি। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে কালীর ধ্যান করছেন। তিন-চার দিন ক'রে হ'ল না শুনে আমাদের মনে হবে, তিনচার দিন করলেই হয়ে যাবে। নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলতেন ধ্যানসিদ্ধ। তাঁর তিন-চার দিন আমাদের তিন-চার বছরের মতোও নয়। এর অর্থ অনেক গভীর। ঠাকুর কালী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট করবার জন্য বলছেন, যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। তুমি ব্রহ্মের উপাসনা করতে, এখন কালীর ধ্যান ক'রছ—তা নয়। তোমার ব্রহ্ম আমার কালী ভিন্ন নয়। কালী আদ্যাশক্তি—আদিতে শক্তি। সকল বৈচিত্র্যের কারণ—সকল বৈচিত্র্য যা থেকে উদ্ভূত সেই শক্তি। অনভিব্যক্ত জগৎকে যিনি সৃষ্টি করেন, ধ'রে রাখেন এবং যিনি নিজের মধ্যে উপসংহার করেন তিনিই কালী, তিনিই ব্রহ্ম।

যাঁ থেকে এই জগতের উৎপত্তি, যাঁতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবিত, প্রাণবন্ত হ'য়ে অবস্থিত থাকে, আর অন্তে যাঁতে প্রবেশ ক'রে আবার

অনভিব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয়—তিনিই ব্রহ্ম। ঠাকুর তাঁকেই 'কালী' বলছেন। বস্তু ভিন্ন নয়। একই ব্রহ্মের দুটি দিক্। সক্রিয় অবস্থানটি কালী, নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে বলি 'ব্রহ্ম'। পার্থক্য বস্তুতে নেই, পার্থক্য শুধু দৃষ্টিতে। দৃষ্টি অনুসারে দেখে আমরা দুটি নাম দিয়েছি। তাঁর সৃষ্টি অনন্ত, কোথাও লয় হচ্ছে, কোথাও বা সৃষ্টি হচ্ছে। অনন্ত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বা সমষ্টিরূপ কল্পনা করা কঠিন। তাই সগুণ-ব্রহ্ম ও নির্গুণ-ব্রহ্ম এই ভাবে নাম দিই।

ঠাকুর আরো ব্যাখ্যা করছেন, "ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।" এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ ক্রিয়াগুলি যখন তাঁর উপর আরোপ করি, তখন তিনি আদ্যাশক্তি বা কালী। আর যখন তা না ক'রে তাঁর নিষ্ক্রিয় স্বরূপ ভাবি, তখন তিনি ব্রহ্ম। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি এক হ'য়ে আছে। যখন কিছু পোড়াচ্ছে তখন বলি অগ্নি, আর যখন তা না করছে, তখন অগ্নি তার স্বরূপে স্থিত হ'য়ে আছে, তার শক্তির তখন প্রকাশ নেই। কাজের দ্বারা শক্তির অনুমান করতে হয়; ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ হ'লে বলি দাহিকা-শক্তি—অগ্নির ভিতর আছে। তাই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। রামপ্রসাদ গানে বলছেন, 'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

ঠাকুর বলছেন, 'ওকেই শক্তি ওকেই কালী আমি বলি।'

গিরিশ ও থিয়েটার

এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ হ'ল। এদিকে রাত হ'য়ে গেছে। গিরিশ হরিপদকে একখানা গাড়ী ডেকে আনতে বলছেন, তাকে থিয়েটারে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "দেখিস, যেন আনিস।"

ঠাকুরের এই টিপ্পনীটুকুর তাৎপর্য এই যে, গিরিশের থিয়েটারে যাবার টানটা পুরোমাত্রায় আছে। তাই তিনি বলছেন, এ কথা।

গিরিশের ঠাকুরকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, আবার থিয়েটারেও যেতে হবে। এই দোটানার মধ্যে তিনি প'ড়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "ইদিক্-উদিক্ ত্বদিক্ রাখতে হবে ; জনক-রাজা ইদিক্ উদিক্ ত্বদিক্ রেখে, খেয়েছিল ত্বধের বাটি।" জনক-রাজা এই জগতে জ্ঞান আর ব্যবহারে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞানপূর্বক ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বর এবং জগৎ ত্বদিক্ রেখে সংসারকে ভোগ করেছেন। ঠাকুর গিরিশকে থিয়েটার ছাড়তে নিষেধ না ক'রে বলছেন, "না না, ও বেশ আছে ; অনেকের উপকার হচ্ছে।" এই নিষেধ না করার ত্বটো দিক আছে। থিয়েটারের ভিতর দিয়ে গিরিশ অনেক উচ্চতত্ত্ব পরিবেশন করছেন নাট্যরসের আধারে এবং এইভাবে লোককল্যাণ হচ্ছে। আর একটা দিক হ'তে পারে যে গিরিশের মন এখনও দোটানা থেকে মুক্ত হয়নি। ঠাকুর বলছেন, 'ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ি খসে যায়, তার আগে টেনে মামড়ি ছাড়ালে আরও ঘা হয়। গিরিশের মন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হলেও থিয়েটার ইত্যাদির চিন্তা থেকে মুক্ত হয়নি। তাই ঠাকুর বলছেন, এখন ছাড়ার দরকার নেই।

গিরিশের আদর্শ তিনি সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। যাঁরা সংসারে থেকে ভগবানের চিন্তা করছেন, তাঁদের বলছেন, 'এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে সংসার কর।' কিন্তু ত্যাগী সন্তানদের বলছেন, 'দেখ, রসুনের বাটি, যতই ধোও, গন্ধ থেকে যায়।' তাঁর এত প্রিয় গিরিশের সম্বন্ধেও এই মন্তব্য করছেন। আগুনে পুড়িয়ে নিলে সে গন্ধটুকু যায়, হয়তো এখনও আগুনে পোড়াবার সময় হয়নি। তিনি অপেক্ষা করছেন, তাঁর এই রসুনের বাটিটিকে তিনি অপূর্ণ রেখে যাবেন না। আগুনে পুড়িয়ে নেবার সময় যে আসছে, এটি গিরিশের পরবর্তী-

কালের জীবন দেখে বোঝা যায়। শেষ জীবনে তাঁর ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা মুখে আসত না। সর্বদা তাঁর অহেতুক কৃপা, অগাধ ভালবাসা, করুণার কথা বলতেন, যা বর্ণনা করতে করতে দুচোখ বেয়ে নেমে আসত অশ্রুধারা। সেই পোড়ানো রসুনের বাটি গিরিশ, এখনো তাঁর আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হওয়ার অবস্থা আসে নি।

নরেন্দ্র ভবিষ্যৎ গিরিশকে দেখছেন না ; বর্তমান গিরিশকে দেখে মৃদুস্বরে বলছেন, "এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে! আবার থিয়েটার টানে!" ঠাকুর ভবিষ্যৎ গিরিশকে দেখছেন। পক্ষপাতশূন্য, নিষ্কিঞ্চন অবতার যিনি, তিনি গিরিশের এত অত্যাচার, আব্দার সহ্য করেছেন পরবর্তী জীবন লক্ষ ক'রে। সে তাঁর অন্তরঙ্গ, তার উপরের আবরণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, তাই ঠাকুর ব্যস্ত নন। অদূরদর্শীরা বর্তমান দেখেই মানুষকে বিচার করেন চিরকালের জন্য, ঠাকুর তা করেন না ; তাই মদ্যপ লম্পট গিরিশকে নয়, সর্বকলুষমুক্ত গিরিশকে তিনি এত আদর করছেন। আর এ আদর যে অপাত্রে বর্ষিত হয়নি, তা গিরিশের পরবর্তী জীবন দেখলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

সতের

কথামৃত—১।১৪।৯-১০

দশম পরিচ্ছেদটির আগাগোড়া শ্রীম নিজের অন্তরের ভাবটি সকলের কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। তার আগে নরেন্দ্রকে কাছে বসিয়ে ঠাকুর একদৃষ্টে দেখছেন, আরো কাছে সরে বসলেন। মাস্টারমশায় বলছেন, নরেন্দ্র অবতার মানে না। তাতে কি এসে যায়, ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলে উঠেছে। গায়ে হাত দিয়ে নরেন্দ্রকে বলছেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি'; ভাব হচ্ছে, নরেন্দ্রর অবতার না মানার কারণ, তিনি তাঁর চোখের সামনে সেই আলো জেলে দিচ্ছেন না, তাই তিনি যেন অভিমান ক'রে অবতার মানছেন না! ঠাকুর বলছেন, "আমরাও তো মানে আছি।"

বিচার ও তত্ত্বানুভূতি

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।" তিনি কখনো কখনো বিচারে উৎসাহ দিতেন, কেউ বারণ করলে বলতেন, এই বিচারের মানে আছে। কিন্তু আবার বলছেন, বিচারে তাঁকে পায় না। ভাব হচ্ছে, এই বিচার একটা পথ, কিন্তু সেটাই শেষ পথ নয়। বিচারের একটি লক্ষণ হ'ল এই যে, বিচারের দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বনির্ণয় হয়। গীতায় ভগবান বলছেন, যারা বিচারশীল তাদের মধ্যে আমি বাদ-রূপে আছি—'বাদঃ প্রবদতামহম্।' তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য যে বিচার, তাকে

'বাদ' বলে। তত্ত্বনির্ণয়ের উপায়রূপে বিচার গ্রহণযোগ্য, কিন্তু বিচার চলতে থাকলে বোঝা যাবে, তত্ত্ব এখনো নির্ণয় হয়নি। "নিমন্ত্রণবাড়ির শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায়। অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে। দই পাতে পাতে পড়লে কেবল 'সুপ্ সাপ্'। খাওয়া হ'য়ে গেলেই নিদ্রা।" ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের অনুভব যত গাঢ় হবে, ততই বিচার কমবে। পূর্ণলাভ হ'লে আর শব্দ—বিচার থাকে না, তখন নিদ্রা, সমাধি। ঠাকুর তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখছেন, আর কি বিচার করবেন? আমরা যখন এই সব ঘরবাড়ী প্রত্যক্ষ দেখছি, তখন ঘরবাড়ী আছে কি না, এ বিচার করতে বসি কি? সে অনুভূতি এত গভীর ও তীব্র যে, সংশয় থাকে না। সে-রকম ঈশ্বর দর্শন যখন স্পষ্ট হয়, সে দর্শন এত গভীর ও তীব্র যে, কোন সংশয় ওঠে না। তাই বলছেন, ঈশ্বরকে যত লাভ করবে, তত বিচার কমবে। ভগবদ-নুভূতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকলেই ক্রমশঃ বিচার, দ্বন্দ্ব, সংশয় ক'মে যায়। ঠাকুরের কথা 'কলসী খালি থাকলে শব্দ হয়, ভরে গেলে আর শব্দ হয় না।' মানুষের হৃদয় ভগবদনুভূতিতে পূর্ণ হ'লে আলোচনা, বিচারের আর অবকাশ থাকে না। ঠাকুর যে কাউকে বিচার করতে বলেন নি, তা নয়। অনেক সময় তিনি নিজে বিশেষ ক'রে দুই ভিন্ন মতাবলম্বীকে বিচারে লাগিয়ে দিতেন। নরেন্দ্রর সঙ্গে গিরিশ অথবা কেদারকে বিচারে লাগিয়ে আনন্দ করতেন। আনন্দের কারণ বিচারশীল দুজনেই ভক্ত, কেবল দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। নরেন্দ্র যেন আধা নাস্তিক, আর এঁরা অতি-বিশ্বাসী। তাঁদের মধ্যে মত-দ্বৈধতা প্রবল। ঠাকুর মধ্যস্থ হ'য়ে শুনতেন, আর কখনো এ পক্ষের আর কখনো ও পক্ষের হ'য়ে টিপ্পনি কাটতেন, কাউকে ছেড়ে দিতেন না।

মনে রাখতে হবে, ঠাকুর লেখাপড়া করেন নি; তর্কবিদ্যা (Logic), দর্শনশাস্ত্র (Philosophy) কিছুই পড়েননি। স্বামীজীর সবই পড়া এবং বুদ্ধি ক্ষুরধার। তবু ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, যে-বিষয়ে তিনি জানেন না, শুধু শুনেছেন, সে-বিষয়েও তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত বিচারশীল মনের পরিচায়ক।

ঠাকুরের সর্বপ্রসারী দৃষ্টি

একজন একটি মত সম্পর্কে বললেন, "মহাশয়, এই একটি মত।" ঠাকুর জিজ্ঞসা করছেন, ওরা ঈশ্বর মানে কি না। ঈশ্বর মানে শুনে বললেন, "তা হলেই হ'ল"। অথবা তারা যদি আধ্যাত্মিক জীবন মানে, তা হলেই হ'ল। তাদের মতবাদ যাই হ'ক তাদের গন্তব্যস্থল কি? ঠাকুরের এই বিশাল সর্বাবগাহী উদারতা কাউকে বাইরে রাখছে না, নাস্তিককেও না। কেউ যদি বলেন, অমুক লোক নেশাখোর বা দুষ্ট প্রকৃতির, ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। ঠাকুর শুধু বর্তমান অবস্থাটি না দেখে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব দেখে বিচার করছেন। মাস্টার-মশায়কে বলছেন, তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সব তো জানি! মাস্টারমশায় নত মস্তকে স্বীকার করলেন। ঠাকুর বলছেন, আমি যা বলছি. বিচার ক'রে নিতে হবে না, বিশ্বাস কর।

আবার নরেন্দ্রকে বলছেন, যা ব'লব যাচিয়ে—বাজিয়ে নিবি। অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথ্য। মাছ এলে মা যেমন যার পেটে যা সয়, সেই রকম রান্না করেন। ঠাকুরও ঠিক তাই, যার যাতে রুচি তার জন্য সেইমতো ব্যবস্থা করলেন।

যুগাবতার হ'য়ে যিনি জগৎ কল্যাণের জন্য এসেছেন তাঁকে তো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কথা ভাবলে হবে না, জগতের সকলের কাছে এমন পথ বলে দিতে হবে, যাতে কেউ বাদ না পড়ে। কেউ যেন

অভুক্ত না থাকে। শুধু খেতে পাওয়া নয়, ভরপেট। একজন ভক্ত কথা-প্রসঙ্গে বললেন, 'মহাশয় অন্য জায়গায় ছিঁটে ফোঁটা, এখানে ভরপেট।' এটি অবতারের বৈশিষ্ট্য। সকলের কল্যাণের জন্য এমনভাবে খাদ্য পরিবেশন করেন যে, প্রত্যেকেই তার রুচিমত খাদ্য পেয়ে পরিপুষ্ট হ'য়ে বলবান্ হবে, চরম কল্যাণ লাভ করবে।

ঠাকুরের বাহ্যজগৎ ভুল হ'য়ে যাওয়ার বিষয়ে মাস্টারমশায় আরো একটু আলোচনা করেছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা। বিশেষতঃ নরেন্দ্রর জন্য তিনি পাগল। ঠাকুর নরেন্দ্রর গায়ে হাত বুলিয়ে, মুখে হাত দিয়ে আদর করছেন, বলছেন, "হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

ঠাকুরের উচ্চভাব ও সহানুভূতি

একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলছেন, "আপনি সব সময় এ-রকম 'নরেন, নরেন' করেন, শেষে আপনারও ভরত-রাজার মতো অবস্থা হবে।" হরিণ ভেবে ভরত-রাজা হরিণ হ'য়ে ছিলেন। এ-কথায় ঠাকুরকে তাঁর মায়ের কাছে ছুটতে হ'ল। এসে বললেন, 'মা দেখিয়ে দিলেন, তোর ভিতরে আমি সাক্ষাৎ নারায়ণকে দেখতে পাই, তাই এ-রকম করি। ছেলেদের ভিতর নারায়ণকে দেখি, তাই এত ভালবাসি। যেদিন তা না দেখতে পাব, তোদের মুখদর্শনও করতে পারব না।' এ স্নেহ ব্যক্তির প্রতি নয়, ব্যক্তির অন্তরালে যে তত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশিত হ'ত; এ ভালবাসার উপলক্ষ্য কেবল তিনি।

মাস্টারমশায় লিখছেন, যাকে নিয়ে এত আনন্দ, এত আদর করছেন, দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হ'য়ে যাচ্ছেন, একসময় সেই নরেন্দ্র কোথায় রইল খোঁজ নেই। মন প্রাণ তখন ঈশ্বরে গত হয়েছে। যতক্ষণ মন বাহ্যজগতের দিকে আছে, ততক্ষণ সে কি নিয়ে থাকবে? শুদ্ধ আধার,

শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের নিয়ে। ঠাকুরের মন সর্বদা অন্তরের সেই তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট। তাই বাইরে যখন কেবল তার ঈষৎ প্রকাশ দেখতে পান এই শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেগুলির ভিতর, তাদের নিয়ে মনটা কিছুটা জগতের দিকে রাখতে পারেন। না হ'লে মন জগতের দিকে নামতে চায় না। এই ছেলেরা তাঁর মনকে নামাবার উপায় বা সিঁড়ি। তখন তিনি জগতের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করছেন এবং তাদের সেই দুঃখের পারে যাবার পথ দেখাচ্ছেন।

মনে হবে, ঠাকুরের মন যখন এতই সহানুভূতিশীল, তখন জগতের দুঃখ-কষ্টই কি তাঁর মনকে নামানোর উপায় হ'তে পারে না? মন সমাধি অবস্থায় গেলে জগতের দুঃখকষ্টের অনুভূতি সেখানে পৌঁছয় না, তারপর কোন শুদ্ধ আধারকে অবলম্বন ক'রে মন ক্রমশঃ নামে। এইসব বালকদের ভিতর দিয়ে মনটা জগতের দিকে আকৃষ্ট হবে ব'লে, ঠাকুর এদের কাছে কাছে রাখতেন। না-হ'লে তিনি শরীরও রাখতে পারতেন না। বলছেন, দেখ, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে একটি দুটি কাছে থাকলে ভাল হয়।' প্রয়োজন তাঁর সেবার জন্য নয়, মনকে নীচে নামিয়ে আনার অবলম্বন হিসাবে। সে অবলম্বন এমন হওয়া উচিত, যার সঙ্গে তার মনের একটা সম্বন্ধ আছে—তাই শুদ্ধসত্ত্ব বালকের প্রয়োজন। যাদের মন সংসারের আবিলতাকে স্পর্শ করেনি, কোনরূপ কালিমালিপ্ত হয় নি, এমন শুদ্ধ পবিত্র মনের ছেলেদের প্রতি আকর্ষণে ঠাকুর মনকে সমাধির একটু নীচের স্তরে নামিয়ে রাখতে পারতেন। তারপর বাহ্যদশায় মন এলে জগতের দুঃখ-কষ্ট এমন প্রবলভাবে অনুভব করতেন, যার গভীরতা আমাদের কল্পনাতীত। সে দুঃখ এমন সর্বব্যাপী হ'য়ে থাকত যে, প্রত্যেকের দুঃখের স্পর্শ তাঁর নিজের হৃদয়ে অনুভব করতেন। সর্বত্র আপনাকে বিস্তার ক'রে, সকলের দুঃখে নিপীড়িত হওয়া অবতার ছাড়া আর

কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যান্যদের মনে হয়তো একটু সহানুভূতি আসে, কিন্তু অবতার একাত্ম হ'য়ে অপরের দুঃখ নিজ হৃদয়ে অনুভব করেন—এই একাত্মতা সাধারণের হয় না। স্বামীজী বলতেন, বিরাট বিশ্বের এই দুঃখ অনুভব করার জন্য ঠাকুরকে ভক্তি করি। গিরিশবাবুও স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর এক শিষ্যকে বলতেন, 'তোর গুরুকে এই জন্য মানি, তার হৃদয় কত বিশাল।' এখন যে হৃদয় ঠাকুরকে এত আকর্ষণ করছে, বুঝতেই পারা যায়, সে হৃদয়ের বিশালতা, শুদ্ধি, পবিত্রতা, সকলের দুঃখে সমবেদনাবোধ কত গভীর! আর ঠাকুরকে দেখি, তিনি তাঁর আদরের দুলাল নরেন্দ্রকে ভৎর্সনা করছেন, 'তোর এত হীনবুদ্ধি, নিজের সমাধিসুখে মগ্ন হ'য়ে থাকতে চাস? সংসারে এত লোকের দুঃখ-কষ্ট দেখছিস না? তুই এদের আশ্রয়স্থল হবি, এই তো আমি চাই।'

যে নরেন্দ্রকে ঠাকুর এত আদর করছেন, এত সাধনা করিয়েছেন, নর-ঋষির অবতার ব'লে বলছেন, সেই নরেন্দ্রর প্রতি এই ভৎর্সনা-বাক্যে একটু অনুমান করতে পারি—ঠাকুরের হৃদয়ের বিশালতা কত গভীর!

শ্রীম'-র চিন্তা

পূর্ব প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথাগুলি শ্রীম'র মনে যে চিন্তা-সমষ্টির উদ্ভব করেছিল, সেগুলি এই দশম পরিচ্ছেদে তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলছেন, বিচার আর কি ক'রব? বিশ্বাস চাই। তিনি ভাবছেন, "সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দপোয়া মানুষ কি ক'রে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝলাম, বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না?"

বিচার দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করতে পারে না। অনন্ত কি ক'রে সান্ত হবেন? ঈশ্বরের অসীমত্ব আর মানুষের দৃষ্টির

ক্ষুদ্রত্ব—অত্যন্ত বিপরীত দুটি বস্তু। ভাগবতে দেবকী তাঁর স্তবে বলছেন :

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ।
(১০.৩.৩১.)

যাঁর বিশালতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, সমস্ত বস্তুর পরস্পরের দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজ দেহের এক কোণে ধারণ ক'রে আছেন. সেই তিনি আবার আমার গর্ভে সন্তানরূপে এসেছেন, একথা কে বিশ্বাস করবে? দেবকীর এই অপূর্ব কথাটিই মাস্টারমশায় এখন ভাবছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সেই ধারায় বিচার করেও কিছুই বুঝলেন না। 'অনন্ত কি সান্ত হয়?' ঠাকুর বলেছেন, যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় না।' এই এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে আর কি ঈশ্বরের কথা বুঝব? 'এক সের বাটিতে কি চার সের দুধ ধরে?' এই সব কথা তিনি ভাবছেন। আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বোঝা যায়? ঠাকুর যদি দেখিয়ে দেন, যদি দপ্ ক'রে আলো জ্বলে, তা হ'লে একক্ষণেই বোঝা যায়! ঈশ্বরের অলৌকিক কৃপার পরিণাম এই আলো জ্বেলে দপ্ ক'রে দেখিয়ে দেওয়া! বাক্য-মনের অতীত যিনি. তাঁকে মনের দ্বারা চিন্তা করা, শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই সে নিষ্ফল প্রয়াস না ক'রে তাঁর শরণাপন্ন হই। প্রয়াস যে নিষ্ফল প্রথমে তা বুঝতে পারি না; পরে যখন বুঝতে চেষ্টা করি, বিচার করি, তখন একজনের বিচার অন্যজনের বিচার দ্বারা খণ্ডিত হয়।

বিচার ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত

সর্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী শঙ্করও বলেছেন, তর্কের দ্বারা কখন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। খুব বড়

কথা। ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, আমি বড় পণ্ডিত, বহু বিচার ক'রে, একজনের মত খণ্ডন ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠা করলাম। ভবিষ্যতে আর একজন পণ্ডিত এসে তা খণ্ডন ক'রে অন্যমত প্রতিষ্ঠা করবে। অনন্তকাল এই ভাবে চলে এসেছে ও চলবে। সুতরাং তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কোথায়? তা হ'লে কি উপায় হবে? উত্তরে বলেছেন, শাস্ত্র-প্রমাণ অর্থাৎ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ বিদ্বদ্‌জনের অনুভব। তত্ত্বকে যাঁরা সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের অনুভব হ'ল প্রমাণ, যার উপর নির্ভর ক'রে তত্ত্ব নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিয়েও নানা তর্কজাল, মতপার্থক্যও অনেক। বেদকে সকলেই মানলেও তার ব্যাখ্যা নিয়ে রয়েছে নানা মতবিরোধ, যে বিরোধ আজও চলছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য মতের আবির্ভাবে এ বিরোধ বাড়বে।

ঈশ্বরকৃপা ও শরণাগতি

ঠাকুর এক কথায় বলছেন, এভাবে হবে না। তিনি যদি দপ্‌ ক'রে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন, তত্ত্বকে আমাদের অনুভবগম্য ক'রে, নিজের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন ক'রে আমাদের সামনে ধরেন, তা হলেই জানা সম্ভব ; না হ'লে নয়। ঠাকুরের এটি খুব বড় কথা। নিঃসংশয়িতভাবে তত্ত্বকে জানার অন্য কোন উপায়ও নেই। আসল কথা. 'এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?' ক্ষুদ্র মন দিয়ে কি অনন্তকে ধারণা করতে পারা যায়? শাস্ত্র এবং সাধুরা বারবার এ-কথা বললেও আমরা তা বুঝি না। অহঙ্কারবশতঃ মনে করি, সব বুঝে নেব। কে বুঝবে? আমি বুঝব! কিসের সাহায্যে? বুদ্ধির সাহায্যে। প্রথম কথা— যে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝব, তা কি রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়েছে? তা না হ'লে, যদি মনে কোন তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ থাকে, অন্য কিছু বুদ্ধিগম্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ—বাক্য-মনের যা অতীত, তাঁকে বাক্য-মনের

ভিতর সীমিত ক'রে অনুভব বা প্রকাশ করা যাবে না। ঠাকুরের কথা, কৃপা ছাড়া কোনও পথ নেই। কৃপা কার উপর হবে? তিনি কার উপর করবেন? এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র করণীয়, তাঁর কৃপা লাভ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা, নিজের যতটুকু শক্তি তার ঠিকঠিক সদ্ব্যবহার করা। করেও যখন দেখা গেল, আমাদের দ্বারা হচ্ছে না, তখন নিজেদের অসহায় বোধ করা। যখন সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে মনে দীনতা আসবে, তখনই হয়তো তাঁর কৃপা হবে। তার আগে নয়। সুতরাং, আমাদের অহং-ভাব বুদ্ধির অভিমান– সব চূর্ণ করবার জন্যই আমাদের সমস্ত সাধন॥

সাধন ক'রে যদি মনে হয়, খুব সাধন করছি, তাতেও অভিমান বাড়ানো হচ্ছে। বিচারশীল হ'য়ে সাধন করলে বোঝা যাবে, যতই সাধন করি, অগ্রসর হবার পথ হচ্ছে না। সাধন করতে করতে যখন ভাবি কিছু হচ্ছে না, এগোতে পারছি না, অভিমান কি সম্পূর্ণ চূর্ণ হচ্ছে? যদি না হয়, অন্ততঃ সেই পথে চলেছি কি না, অথবা সাধনের অকিঞ্চিৎকরত্ব অনুভব করছি কি না?

এইভাবে, পূর্ণরূপে হৃদয়ে সাধনের অকিঞ্চিৎকরত্বের অনুভব না হ'লে তাঁর কৃপা হয় না। যতক্ষণ সামনে 'আমি' রয়েছে, সে যেন দেওয়াল তুলে তাঁর কৃপার আলো প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। সাধনের দ্বারা, এই অভিমানের বেড়া নাশ করতে হবে। 'আমি'-কে নিশ্চিহ্ন করাই হ'ল সাধনের মূলকথা। যদি তা পারা যায়, তা হ'লে বুঝব, যে পরিমাণ তা পেরেছি, সে পরিমাণ তাঁর দিকে এগোচ্ছি। ঠাকুর এখানে বলেছেন, "যত তাঁর দিকে এগোবে, তত বিচার কমে যাবে।" 'বিচার' বলতে বোঝাচ্ছেন—অহংকার-প্রসূত যে বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে যাই যে, আমার মতো বড় পণ্ডিত আর কেউ নেই। যত অনুভব স্পষ্ট হবে, গভীরতা তত বাড়বে। অর্থাৎ যিনি যত নিকট

হবেন, বিচার তত দূরে সরে যাবে। সাধক তত্ত্বে পৌঁছলে সব বিচার শান্ত হ'য়ে যাবে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো একটিও ঢেউ উঠবে না— এই হ'ল লক্ষণ।

লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, তিনি বিচারের অতীত বস্তু, তা বোঝবার জন্য গোড়ার দিকে বিচার প্রয়োজন। বুঝতে হবে, সেই বস্তুতে পৌঁছতে হ'লে বাক্যমনের সার্থকতা চিরতরে ভুলতে হবে। ভাষায় প্রকাশ তো দূরের কথা, বস্তুকে আমি মনেও ধারণা করতে পারব না—মন এই প্রকার সম্পূর্ণ দৃঢ় নিশ্চয় হ'লে আর বিচারের অবকাশ থাকে না। তিনি তখন পরিপূর্ণরূপে চারিদিকে প্রকাশিত হ'য়ে পড়েন দপ্‌ ক'রে। এটা একটু একটু ক'রে হয় না, তাই বলছেন 'দপ্‌ ক'রে'। এমন একটা আবরণ আছে, যার জন্য বাইরের আলো আসছে না। আবরণ ভেঙে দিলে দেখা যায়, সমস্ত অন্তর সেই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। জ্যোতির্ময় হওয়াই—দপ্‌ ক'রে আলো জ্বলা। তার জন্য আমাদের করণীয়, দেওয়াল বা বেড়াটাকে ভাঙার চেষ্টা করা।

এর পরের কথা হ'ল—কৃপা

কৃপাই চরম অবলম্বন। তা লাভের যোগ্যতা—একটিই। তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। তা যতক্ষণ না করছি, কৃপার অনুভূতি হবে না। হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত যতক্ষণ না করছি, 'আমি'র বেড়াটিকে না ভাঙছি, ততক্ষণ কৃপার অনুভূতি হবে না। ঠাকুরের কথা আছে, 'কৃপা বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দে।' 'পাল তোলা' মানে তিনি যে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন, তার সহযোগিতা করা। পাল হচ্ছে শরণাগতি, শরণাগতির পাল তুললে তাঁর কৃপা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। তখন দপ্‌ ক'রে আলো জ্বলে সমস্ত অন্তর উদ্ভাসিত হবে। আনাচে-কানাচে কোথাও অন্ধকার থাকবে না, সংশয় দ্বিধার লেশমাত্র

থাকবে না। সর্বাবগাহী সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে, সে সত্য আংশিক নয়, সে সত্য সম্পূর্ণ। অবতারলীলায় বিশ্বাস তাঁর কৃপা না হ'লে অসম্ভব। কৃপা না হ'লে মানুষের ভিতর মানুষ হ'য়ে তিনি অবতীর্ণ হ'তে পারেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আঠার

কথামৃত—১।১৫।১

ঠাকুরের গলরোগ ও কলকাতা-আগমন

কথামৃতের পাঁচটি ভাগ যেভাবে রচিত তাতে মনে হয়—প্রত্যেক খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রতিটি অধ্যায়ও যেন স্বতন্ত্র। শ্রীম ঘটনাগুলি এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, প্রতি খণ্ডের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ভক্তেরা একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র পাবেন। সর্বত্রই ঘটনাগুলি বর্ণনার প্রারম্ভে মাস্টারমশায় সংক্ষেপে বর্ণনীয় স্থানটির চিত্র উপস্থাপিত ক'রে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি-বৃন্দের নামোল্লেখ করেন, যাতে পাঠক সেই দৃশ্যটি অনুধ্যান ক'রে মনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পশ্চাৎপট তৈরী ক'রে নেন।

ঠাকুর অসুস্থ, শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। তাই চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য তাঁকে শ্যামপুকুরের বাড়ীটিতে আনা হয়েছে। কারণ তখন মোটরগাড়ীর প্রচলন হয়নি, ঘোড়ার গাড়ীতে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যেতে ডাক্তাররা সহজে রাজী হতেন না। কিন্তু কলকাতায় ঠাকুর থাকবেন কোথায়? ভক্তদেরও কারো এত বড় বাড়ী ছিল না, যেখানে ঠাকুর এবং তাঁর সেবকদের স্থান সংকুলান হয়। এক বলরাম-মন্দির, কিন্তু সেখানে সদরে বহু লোকের যাতায়াত।

আর কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরের উন্মুক্ত পরিবেশে বাস করতে যিনি অভ্যস্ত, তিনি সংকীর্ণ স্থানে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতো থাকতে পারবেন না। তাই কলকাতায় তাঁর জন্য নির্বাচিত প্রথম বাড়ীটিতে পদার্পণ করেই তৎক্ষণাৎ তিনি চলে এলেন বলরাম-মন্দিরে, ঐরকম খাঁচার মধ্যে থাকতে পারবেন না ব'লে। অবশেষে শ্যামপুকুরের বাড়ীটি পাওয়া গেল।

অধুনা বাড়ীটি দ্বিধাবিভক্ত। ঠাকুর যে ঘরটিতে ছিলেন, সেই ঘরে স্থানীয় ভক্তেরা এখন কালীপূজার দিনে উৎসব করেন। কারণ, এখানেই একদিন ঠাকুরের নির্দেশে ভক্তেরা কালীপূজার রাত্রে পূজার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিমা আনয়ন, পূজারী ও পূজার স্থান নির্বাচন, এ-সব ব্যবস্থা হয়নি। ভক্তেরা উৎসুক আগ্রহে ঠাকুরের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সন্ধ্যা সমাগত, ঠাকুর গভীরভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভক্তেরাও সেই ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে ভগবৎ-চিন্তা করছেন। সহসা গিরিশবাবুর মনে হ'ল, ঠাকুরই সাক্ষাৎ মা কালী, এখানে উপস্থিত। তখন 'জয় মা', 'জয় মা' ব'লে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাবে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর দণ্ডায়মান হলেন, হাতে বরাভয়মুদ্রা। সাক্ষাৎ তাঁর দেহকে অবলম্বন ক'রে জগন্মাতা ভক্তদের পূজা গ্রহণ করবার জন্য উপস্থিত। সেই দিনটির স্মরণে এখনও কালীপূজার রাত্রে মায়ের এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়। ঐ বাড়ীতে এইদিনের ঘটনার ছবি মাস্টারমশায় এখানে এঁকেছেন।

সংসার-জীবনের কৌশল

এই পরিচ্ছেদে ঠাকুর যে কথাগুলি বলছেন, তা কারো প্রশ্নের উত্তরে নয়, স্বগতোক্তির মতো। সামনে ঈশান ছিলেন। তিনি ভক্ত জ্ঞানী,

জাপক, খুব গায়ত্রী-পুরশ্চরণাদি করতেন ; দাতা-পুরুষ, ঋণ করেও দান করতেন। ঠাকুর তাঁর খুব প্রশংসা করেন। তাই ঈশানকে দেখে সংসারে কি-রকম ক'রে থাকতে হয়, এই ভাবের উদ্দীপনা ঠাকুরের মনের মধ্যে এল। তিনি বলছেন, "যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ!" মাথায় দুমণ বোঝা নিয়ে সে বর দেখছে। "পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।"

ঠাকুর সংসার-ত্যাগের কথা প্রায় বললেও সংসার ভগবদ্ভক্তি বা ধর্মজীবনের বিরোধী—এ-কথা কোথাও বলেন নি। বাস্তবকে তিনি অস্বীকার করেন নি ; বলেছেন মনকে আগে থেকে তৈরী না ক'রে সংসার করতে গেলে একেবারে ডুবে যাবে। দুধে জলে মিশে যায়, কিন্তু সেই দুধ থেকে নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলে সে মাখন জলে রাখলে আর মেশে না। ঠিক তেমনি মনকে ভগবদ্ভাবে ভাবিত ক'রে, ভক্তি লাভ ক'রে মনকে প্রস্তুত ক'রে সংসারে রাখলে সংসারে মিশে যাবে না। একেবারে নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসারে থাকা—এইটিই সংসারে থাকার কৌশল—বারংবার ঠাকুর এ-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবে এই নির্লিপ্ততার জন্য যথেষ্ট শক্তি দরকার, সাধনের প্রয়োজন। সেজন্য দরকার মাঝে মাঝে নির্জনবাস—এক বছর, ছমাস, তিনমাস, কি একমাস হ'ক। কথাটি রকমারি ক'রে বলার ভাবার্থ হ'ল, যার যতটুকু সাধ্য কর, সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যবস্থা কাউকে দেওয়া হবে না। যে যেমন পারে, মন তৈরী ক'রে সংসারে প্রবেশ করুক। এমন ক'রে সংসারে প্রবেশের কথা কে ভাবে?

আমরা সন্তানদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য নানাভাবে প্রস্তুত করি। কিন্তু সংসারে প্রবেশের জন্য কোন প্রস্তুতি দরকার আছে কিনা, বিচার ক'রে দেখি না। যথেষ্ট উপার্জনশীল হওয়া ছাড়া সংসার

করতে আর কোন যোগ্যতার কি প্রয়োজন হয় না? অন্ততঃ কিছুটা নির্লিপ্ত না হ'তে পারলে দুঃখ-যন্ত্রণার যে সীমা থাকে না, এ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বাপ-মা সে কথা ভাবেন না। বরং পূর্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ যদি কেউ ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তাকে সংসারে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

সংসার ও মনের প্রস্তুতি

শাস্ত্রে বিধান আছে, দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে, নির্জনে সাধনাদি করবার পর যোগ্য বিবেচিত হ'লে লোকে সংসারে প্রবেশ করতে পারে। ঠাকুরও সংসারাশ্রমে প্রবেশ করবার আগে কিছুদিন নির্জনে সাধন ক'রে মনকে প্রস্তুত করতে বলেছেন। এ প্রস্তুতি না থাকার জন্যই সংসার এত ভয়ংকর মনে হয়। অবশ্য সংসারের কলকোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে দূরে পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে হৈ চৈ ক'রে সময় কাটানোকে ঠাকুর নির্জনবাস বলছেন না। বলছেন, নির্জনে গিয়ে ভাবতে হয়, সংসারে ভগবান ছাড়া কেউ আপনার নয়, তাকে কেমন ক'রে পাওয়া যাবে। তা না হ'লে মনের মধ্যে সংসারকে ভরে রেখে যত নির্জনেই যাই না কেন, সেই সংসারই আমাদের ঘিরে থাকবে। কর্মহীন অবকাশে সংস্কারাচ্ছন্ন মন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আগে মনকে সবল শক্তিশালী ক'রে নিতে হয়। সাধক মাত্রেরই জীবনে এইটি অনুভূতির বস্তু। অবতার মহাপুরুষদের জীবনেও মনের এই প্রতিকূলতার দৃষ্টান্ত আছে। মারের সঙ্গে বুদ্ধের যে সংগ্রাম, সে মার আর কেউ নয়, মনেরই প্রতিকূল বৃত্তি।

মনকে বশ করতে হয় ধীরে ধীরে। ঈশ্বরই যে সর্বস্ব—এটি বোধ ক'রে জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হয়। এ বোধ না এলে কখনো আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না। তাই ঠাকুরের উপদেশ—হাতে তেল মেখে

কাঁঠাল ভাঙার মতো অনাসক্ত হ'য়ে জনক-রাজার মতো সংসারে থাকতে হয়। আসক্তি থেকেই যত রকম অশান্তি, উপদ্রব, বিপর্যয়ের সৃষ্টি। সংসারে থাকা, আর আসক্ত হ'য়ে থাকা দুটো ভিন্ন জিনিস। দেহবুদ্ধিরহিত বিদেহরাজ জনক বলতেন:

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব—১৭.১৯)

মিথিলা অর্থাৎ তার মমত্ববোধ যে সব জায়গায় ছড়ানো, তা সব ভস্মীভূত হ'য়ে গেলেও তাঁর ক্ষোভ বা চিত্তচাঞ্চল্য হয় না, কারণ তিনি সর্বদাই আত্মস্থ। তাঁর পক্ষে সংসার ত্যাগ বা গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মজ্ঞের সংসার ও সন্ন্যাস আশ্রমে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানে কোন ইতরবিশেষ হয় না।

এরপর কিন্তু ঠাকুর সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, 'তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে।' 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ'—বিষয়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে তার উপর একটা টান আসে, চিত্তবিভ্রম হয়। মনকে যেখানে রাখবে সেখানকার রঙে অনুরঞ্জিত হবে। কাজেই জ্ঞানী ব'লে সাহস ক'রে বিষয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে নেই। ত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের কোন আপস নেই। তাঁর জীবনে একটি মাত্র কথা আছে, ভগবান্'। ভগবান্ ছাড়া তিনি দ্বিতীয় কিছু জানেন না, কথাপ্রসঙ্গে তা বহুবার বলেছেন—মাইরি বলছি ভগবান্ ছাড়া আর কিছু জানি না। কাজেই যা কিছু ভগবদ্ভাবের বিরোধী সেখানে আপস করেন নি।

মনে রাখতে হবে, ঠাকুর এখানে যাঁদের কাছে বলছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই গৃহস্থ, তাই তাঁদের পক্ষে যা শিক্ষণীয় সেই কথাই বিশেষ ক'রে উল্লেখ করছেন। বলছেন, "কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিনকতক নির্জনে থাকা দরকার; তা এক

বছর হোক ছয়মাস হোক্ তিনমাস হোক্ বা একমাস হোক্। সেই নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য! ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্বস্ব; হায়! কেমন ক'রে তাঁকে পাব!"

কথাগুলি সাধকের জন্য। সাধারণ মানুষ এ-কথা শুনে ভয় পাবে। যাদের এত আপনার মনে করছি, তারা কেউ আমার নয়। এই কথায় ভয় পেলে কি ভগবানের দিকে এগোন যাবে? সংসারে আমরা সবাইকে নিয়ে আনন্দ ক'রে থাকব, আবার ভগবানকেও আস্বাদন ক'রব—এ দুটি এক সঙ্গে কি সম্ভব? এ প্রশ্ন মনের, আমরা ভাবি, এ-ও ক'রব ও-ও ক'রব—তা হয় না।

ভগবানকে চাইতে হ'লে তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ—সন্ন্যাসী, সংসারী সকলকেই—করতে হয়। তফাত এই, সংসারী কিছুদিন সাধন ক'রে, মনকে তৈরী ক'রে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে, দোষ হয় না। আর সন্ন্যাসী সারা জীবন এই ভাবে ব্যয় করেন, তাঁর সংসারের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ঠাকুর অনেক জায়গায় বলেছেন সংসারীর হবে না কেন? হবে। ভক্তেরা সংসারে আবদ্ধ, এ প্রশ্ন বার বার তাঁদের মনে আঘাত করছে, আমাদের কি হবে? ঠাকুর আপস ক'রে বলছেন না যে, নিশ্চয় হবে। বলছেন না, যেমন আছ তেমনি থাকো, তোমাদের হয়ে যাবে। বলছেন, সাধন ক'রে মনকে তৈরী করতে। দুধকে দুধ না রেখে, দৈ ক'রে মাখন তুলে সংসার জলে রাখলে জলে মিশে যাবে না। নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

আমরা গোড়া থেকেই ভাবি জনক-রাজার মতো হবো! তিনি

জ্ঞানী ছিলেন, অথচ সংসার ত্যাগ করেননি। খুব ভাল কথা! ঠাকুর বলছেন যে জনক-রাজার সারাটা জীবন কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? নির্লিপ্তভাবে থাকার জন্য তিনি যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন কঠোর তপশ্চর্যার ভিতর দিয়ে, তা কি তোমরা করেছ? সেটি না করেই সংসারে থাকতে চাও! তা হ'লে তো আর জনক-রাজার মতো সংসারে থাকা হয় না। ঠাকুর এখানে যা বলছেন, সাধারণ মানুষ তা চায় না। সে চায় ইহকাল পরকাল যেমন চলছে—চলুক, তার ওপর একটু ভগবানকে আস্বাদ করা—এ হয় না।

ভগবানকে আস্বাদন করতে হ'লে তাঁর পাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু আমরা কি সমস্তই দিতে পারি? ঠাকুর বলছেন, সাধন ক'রে মনকে তৈরী করতে, যাতে তাঁর ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে পারি। সেই ভগবৎপরায়ণ মন সংসারেই থাকুক, আর বাইরেই থাকুক, কোন ভয় নেই। আসল কথা সংসার ভালও নয়, মন্দও নয়। আমাদের ধর্মপথের প্রতিকূলও নয়, অনুকূলও নয়। আমরা তার সঙ্গে যেমনভাবে ব্যবহার করি, সে সেইভাবেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। আসক্তি-পরায়ণ মন নিয়ে সংসার করলে আমাদের একেবারে বেঁধে রাখবে। মনকে অনাসক্ত রাখার চেষ্টা ক'রে সংসারে রাখলে দোষ নেই। আমরা গানের সময় 'নাথ তুমি সর্বস্ব আমার' বলি, সে কি শুধু গানেরই সময়? গানের প্রকৃত মর্ম অনুভব ক'রে জীবনের প্রধান লক্ষ্য সেইভাবে স্থির করতে হয়। তিনিই যে আমার সর্বস্ব—এ বোধ যদি না আসে, তা হ'লে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ কখনো সম্ভব হয় না। মনকে এভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে সে ভগবানে তন্ময় হ'য়ে থাকতে পারে। যদি সাময়িকভাবে হয়, তাতেও লাভ। সেভাবে কেউ একবার অভ্যস্ত হ'লে সংসার আর তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তিনি তো বড় চুম্বক, সে চুম্বকের আকর্ষণ প্রবল, তাকে প্রতিহত ক'রে সংসার আর মানুষকে টানতে পারবে না।

এই আকর্ষণ অনুভব করতে হ'লে মানুষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কঠোর সাধন তপশ্চর্যা করতে হবে। প্রথমে মনকে সহস্র বন্ধন থেকে একেবারে ছিঁড়ে নিয়ে ভগবানের দিকে যেতে হবে। কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে তবে এ-পথে পা বাড়াতে হবে, তা না হ'লে হবে না। তবে গোড়ায় মানুষকে ও-পথে আশ্বাস দেবার জন্য বলা হয়েছে 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল'। তাৎপর্য এই—হেলায় বা শ্রদ্ধায় নাম কর, সব হ'য়ে যাবে। এভাবে নাম করতে আরম্ভ করলে বোঝা যাবে, আমরা কোথায় আছি। যদি আন্তরিকতা থাকে, বোঝা যাবে—যে ভাবে নাম করছি, তা যথেষ্ট নয়। আরো এগোতে হ'লে ত্যাগ স্বীকার ক'রে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করলে তবে সে ভগবানের দিকে যাবে। সে শুদ্ধি কেমন ক'রে আসবে ?

জীবনের লক্ষ্য

প্রথমে আচার শুদ্ধি করতে হবে ; সমস্ত আচরণ এমন কর যাতে মন ভগবানের দিকে যাবার অনুকূল হয়। তারপর প্রশ্ন উঠবে—তাঁর দিকে এগোতে পারছি কি না ? স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলতেন, 'জপধ্যান করতে আরম্ভ ক'রে কয়েকদিন পরেই অনেকে বলেন—মশাই, আমার কিছু হচ্ছে না।' তিনি তাদের বলতেন, 'আচ্ছা, যা বলছি, তিন বছর চুটিয়ে কর দেখি, যদি তাতেও না হয়, তখন আমাকে এসে চড় মেরো।' —এই ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এ-কথা কেন বলছেন ? বলছেন এইজন্য যে, আমরা কোন মূল্য না দিয়েই জিনিস পেতে চাই। বিনামূল্যে এ জগতে সামান্য বস্তুও পাওয়া যায় না। আর সেই অমূল্য ভগবদ্ভাব কি ক'রে পাওয়া যাবে ? তার মূল্য দিতে হবে। কীর্তনিয়া গান করেন, গোপীরা নদী পার হ'তে এলে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এমনি তো

পার ক'রব না, কড়ি দিতে হবে, এক লক্ষ কড়ি। তারপর কীর্তনিয়ারা আখর দেন, লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য ছেড়ে এক লক্ষ্য হওয়া চাই! এক লক্ষ্য হ'য়ে ভগবানকে ক-জন চান? প্রথমেই তো এক লক্ষ্য হওয়া সম্ভব নয়। তাই একটু তার স্বাদ যাতে পায়, তাই নানা ভাবে পূজা ভজন কীর্তন ভক্তসঙ্গ ক'রে ক্রমশঃ সে পথে অগ্রসর হয়।

ঠাকুর নির্জনে তাঁকে চিন্তা করার কথা বলছেন। অর্থাৎ সংসারের পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে, 'তিনি ছাড়া আমার কেউ নেই' মনে করলে তাঁর দিকে যাবার মতো মনের অবস্থা হবে। প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্য সম্ভব নয়। ভয় পেয়ে যদি সাধন আরম্ভই না করি, এজন্য শাস্ত্র প্রত্যেককে আরম্ভ করার মতো একটা পথ ব'লে দিচ্ছেন। শত কামনায় জর্জরিত মানুষকে বলছেন—হ'লই বা কামনা, ভগবান কল্পতরু, তিনি কামনা পূর্ণ ক'রে দেবেন। তখন মানুষ মনে ক'রে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। ক্রমশঃ চলতে চলতে আকর্ষণ বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে মায়ার বাঁধনও আল্‌গা হ'তে থাকে। এই হ'ল সহজ স্বাভাবিক উপায়। যে মায়ার বাঁধন এত প্রিয় ব'লে মনে হয়, তা ধীরে ধীরে তাঁর কৃপায় খসে যায়। তার আগেই যদি মনে হয়—মায়ার বাঁধন না থাকলে সংসারে কি নিয়ে থাকব?—তা হ'লে মুস্কিল! সংসারে থাকা তো দোষের নয়, কিন্তু ভগবানকে ছেড়ে সংসারে থাকলে দুঃখের শেষ নেই। এই জগৎ অনিত্য, ভগবান বলছেন, 'এখানে এসে আমার ভজনা কর।' তাঁর ভজনা করলে এই অনিত্য সংসারে একটা অবলম্বন পাওয়া যাবে, যা আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে তুচ্ছ ক'রে দেবে! ভাগবত বলছেন, সে আকর্ষণ অন্য সমস্ত আকর্ষণকে ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু এই আকর্ষণ আমাদের একদিনে হবে না, ক্রমশঃ হবে। সংসারীরও হবে।

প্রশ্ন উঠেছে, সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী ও সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী,

এ দুয়ের তফাত কি? ঠাকুর বলছেন কোন তফাত নেই। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। "খই যখন ভাজা হয় দু-চারটে খই খোলা থেকে টপ টপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মতো, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মতো হয় না, একটু দাগ থাকে।" জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে তার দোষ নেই, জ্ঞান তাতে প্রতিহত হবে না। কিন্তু একটু লালচে দাগ থাকে, অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে সে আর ফুটন্ত মল্লিকার মতো নয়। যাক্, সে পরের কথা। ঠাকুর সেজন্য সংসারীদের মন তৈরী করার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে কখনো আপস করেননি। তাঁর ধর্ম কখনো পোষাকি ধর্ম নয়, যা নিয়ে মজলিস ক'রে ধার্মিক ব'লে পরিচিত হ'তে পারব।

সাংসারিক আঘাত ও ভগবদ্-ব্যাকুলতা

ভগবান-লাভের জন্য সর্বপ্রথম ত্যাগ করতে হবে সংসারের প্রতি আসক্তি। যে অত্যন্ত আসক্ত, তার ধর্মজীবন আরম্ভই হয়নি। ঠাকুর বলছেন, 'খেয়ে লে, পরে লে'—ভোগ করে নাও, কিন্তু এগুলি জীবনের অতৃপ্তি দূর করতে পারবে না। এই রূপরসাদির আকর্ষণ মানুষকে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু তার ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছে পূর্ণস্বরূপকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা। ক্ষণিক আনন্দ নয়, নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত অপার আনন্দ পেতে চায় সে। দেশ, কাল, নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, এমন আনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি হবে না মানুষের। এই জন্য যাদের সংসারাসক্ত বদ্ধ-জীব বলা হয়, তাদেরও একটা মুক্তির উপায় রয়েছে। ভগবান এই একটি অতৃপ্তি দিয়ে রেখেছেন—স্বামীজী যাকে বলছেন 'Divine discontent'—দিব্য অতৃপ্তি। এই দিব্য অতৃপ্তি মানুষকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে বাধ্য

করবে কি ক'রে সেই অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। প্রাচুর্য, সুখ, সমৃদ্ধির ভিতরেও এই অতৃপ্তি অসন্তোষ এক এক সময় জেগে ওঠে। যেন মনে হয়, একটা কিছু তার পাওয়া দরকার, যা সে পায়নি এবং জাগতিক ভোগ্য বস্তুর মধ্যে তা পাবেও না। ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়, রাজৈশ্বর্য ভোগসুখের বিপুল সমাবেশের মধ্যেও তাঁর হৃদয় একটা অব্যক্ত বেদনায় কাতর থাকত। ক্রমশঃ এই বেদনা বাইরে রূপ নিয়ে তাঁকে সংসার ত্যাগ করালো।

তার মানে কি সকলকেই সংসার ত্যাগ করতে হবে? সেই পুরানো প্রশ্ন; আর সেই পুরানো উত্তর—না। ঠাকুর তা করতেও বলেননি। কিন্তু সংসারাসক্তি এবং ভগবদাসক্তির সহাবস্থান হয় না— 'দুঁহু এক সাথ মিলত নেহি, রব-রজনী একঠাম'—দিন ও রাত, আলো ও অন্ধকারের মতো সংসারাসক্তি ও ভগবদনুরাগ দুটো কখনো একসঙ্গে মিলতে পারে না। একটি অন্যটিকে বিদূরিত ক'রে দেবে। সংসারাসক্তি ম্লান ক'রে রেখেছে ভগবদাসক্তিকে, কিন্তু সাধনার পরিণামে সংসারাসক্তি ক্রমশঃ শিথিল হবে এবং ভগবদনুরাগ প্রবল হবে। এটি না হওয়া অবধি সংসারে হাবুডুবু খেতে হবে, অসীম দুঃখ পেতে হবে। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে, একটু বৈরাগ্য লাভ ক'রে হয়তো অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেবো। তিনি সে ব্যবস্থাও রেখেছেন; সৃষ্টির রহস্য এই যে, মানুষ চিরকাল কখনো আত্মবিস্মৃত হ'য়ে থাকতে পারবে না। কখন না কখন একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবেই তার মনে, সে আকাঙ্ক্ষা সে হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না, বুঝতে পারছে না, সে কি চায়। কিন্তু কিছু সে চায় এবং তা না পাওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই। জীবের প্রতি ভগবানের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

অনেক সময় আমরা বলি ভগবান দুঃখ কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু এ তার

মহৎ দান। সুখের সংসারে নিমজ্জিত থাকলে কি তাঁর রসাস্বাদ করতে পারতাম? না; এই পরম আনন্দ থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকতাম। সংসারে এত যে বিপর্যয় এত যে পীড়ন যাতনা ভোগ করতে হচ্ছে— এই দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখি, তা হ'লে মনে হবে, আহা, তাঁর কি দয়া!

দিবানিশি যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে তো শুধু দয়া তব, জেনেছি মা, দুখহরা।

এই দুঃখ কষ্টকে তাঁর অসীম করুণা ব'লে গ্রহণ করতে পারলে জানা যাবে যে, তাঁর দিকে যাবার যোগ্যতা ক্রমশঃ আসছে। ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানানো উচিত যে, যে ভাবেই হ'ক, মন যেন আমাদের তাঁর দিকে একটু যায়, যাতে সংসার-আসক্তি ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আসে। এর পর সংসার ত্যাগ করার কথা আসছে না। আসল কথা তিনি। সংসার ত্যাগ ক'রে যাব কোথায়? যতক্ষণ না আমাদের হৃদয় তিনি পরিপূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন, ততক্ষণ যাবার আর কোন স্থান নেই। তিনিই একমাত্র আশ্রয়, যেখানে এই সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। সুতরাং এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তাঁর দিকে যাতে এগোতে পারি, এই প্রার্থনা ঠাকুর আমাদের শেখাচ্ছেন।

ঠাকুর তো বললেন, 'আগে মন তৈরী ক'রে সংসারে প্রবেশ করতে', কিন্তু ক-জন আমরা তা করছি? ক-জন ভগবানকে চাইছি? কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে মানুষ সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করে, তা নয়। গতানুগতিক ভাবে জীবন চলে। ছোট থেকে বড় হ'ল, বিবাহাদি হ'ল, সংসার ক'রল, মৃত্যু হ'ল। বংশ-পরম্পরায় এইভাবে চলে যাচ্ছে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ক-জন সচেতন থাকে? জীবন যেন উদ্দেশ্যহীন চলা, এই চলার কোন সার্থকতা নেই। তাই ঘুরে মরি। যারা এইরকম গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের কথা ঠাকুর এখানে বলছেন না। ঠাকুর বলছেন সাধকদের কথা। যারা সংসারাশ্রমে

যাচ্ছে ভগবান লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই বলছেন, মনকে প্রস্তুত ক'রে গেলে সংসার-আশ্রম প্রতিকূল হবে না। একটু ভয়ের কথাও বললেন, কাজলের ঘরে থাকতে গেলে একটু আধটু কালি লাগে। অবশ্য এও বললেন যে, সেই দাগে কোনও ক্ষতি হয় না।

যাকে তিনি সকলের কাছে দৃষ্টান্ত করবেন, তাকে মল্লিকার মতো নিখুঁত করেন। চরম লক্ষ্যকে স্থির রাখার জন্য ফুটন্ত মল্লিকার মতো খোলা থেকে লাফিয়ে পড়া খইয়ের দৃষ্টান্তটি দিলেন। অর্থাৎ মনে মনে সংসার-ত্যাগই যথেষ্ট নয়, বাইরেও ত্যাগ দরকার। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ত্যাগময় জীবন দরকার।

রাজা জনক

জনক-রাজার দৃষ্টান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বলা হয়। ঠাকুর বলছেন—জনক অমনি হলেই হ'ল? তিনি বিদেহ জনক হয়েছেন। বিদেহ—অর্থাৎ দেহবুদ্ধিরহিত অবস্থা। যে দেহবুদ্ধিরহিত, সে সংসারে অথবা তার বাইরে থাকুক, তার পক্ষে দুই সমান। কারণ তার দেহটিই কেবল সংসারে থাকে। 'আমি দেহ নই' এই বোধে যে স্থির থাকে, তার পক্ষে সংসারে থাকা আর ত্যাগ করা সমান। কিন্তু যতক্ষণ 'আমি'কে অবলম্বন ক'রে আছি, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি রয়েছে। দেহবুদ্ধি থাকায় কোন্‌টা গ্রাহ্য কোন্‌টা ত্যাজ্য, তা বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হ'লে প্রয়োজন হ'ত না।

জনক-রাজা সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের একটা অভিমত শোনা যায়। তাঁরা বলেন, জনক-রাজা গৃহীদের আদর্শ হ'তে পারেন, কিন্তু ত্যাগীর আদর্শ নন। বিদেহ হলেও তাঁকে প্রারব্ধের জন্য সংসারে থাকতে হচ্ছে। তাঁরা বলেন, জনক-রাজা সংসারে থাকতে পারেন; কিন্তু কেন থাকেন? তাঁর তো প্রয়োজন নেই সংসারে থাকার। এটা বলতে

হয় বিধির বিধান, যাতে সংসারীরা তাঁকে গৃহীর আদর্শরূপে পায়। এইজন্য তিনি সংসারে ছিলেন। আচার্য শঙ্কর গীতা-ব্যাখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে বলছেন: 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ'—অর্থাৎ জনক কর্মের দ্বারাই সংসিদ্ধি বা মুক্তি লাভ করেছেন। কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভের দু-রকম ব্যাখ্যা করেছেন। কর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করেছেন যে জনকাদি, তাঁরা সাধক না সিদ্ধ? সাধক হ'লে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে করতে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। অথবা 'কর্মণা সহ'—কর্মকে এক হিসাবে করণ বা উপায়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম তাঁর মুক্তির পরিপন্থী হচ্ছে না। এখানে জনক রাজাকে মুক্ত না-ও বলতে পারেন। আবার মুক্ত হয়েও তিনি কর্মসহ অবস্থান করছেন, যেন দৈবনির্দিষ্ট হ'য়ে তিনি এর ভিতরে রয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নাগমহাশয় ঠাকুরকে সংসার ত্যাগের বাসনা জানালে, তিনি বলেছিলেন, 'না, সংসার ত্যাগ ক'রো না', সংসারীদের পক্ষে এটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে। সকলেই ভগবান লাভের জন্য বেরিয়ে গেলে সংসারীদের মনে দুর্বলতা আসবে, তাদের কোন পথ নেই ভেবে। শাস্ত্র সকলের জন্য পথ নির্দেশ ক'রে দেন।

সাধন ক'রে মুক্ত হ'য়ে গেলে আর সংসারে প্রবেশের ইচ্ছে হবে কেন? সত্য, কারো হয়তো ইচ্ছে হবে না, আবার কেউ হয়তো জনকের মতো দৈবপ্রেরিত হ'য়ে সংসারে প্রবেশ করবে। সংসারের ভিতরে বা বাইরে—উভয় প্রকারের জ্ঞানীই জ্ঞানী হিসাবে তুল্য। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে বলছেন, 'স ব্রাহ্মণ কেন স্যাৎ, যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব'—সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কি রকম থাকবেন? যে রকমই থাকুন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের কোন তারতম্য হয় না। তিনি যখন জেনেছেন, আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কিছুই নই, তখন তাঁর দেহে 'আমি' বুদ্ধি কেন হবে? ঠাকুর আগে যে দু-রকম থৈয়ের কথা

বললেন, তার তাৎপর্য এই—তিনি যেন আভাস দিচ্ছেন, পারো তো ঐ স্ফুটন্ত মল্লিকার মতো হও।

আচার্য ও আদর্শ

এই দুটি অবস্থার মধ্যে জ্ঞানের কোন পার্থক্য হবে না সত্য, তবে আচার্য হ'তে হ'লে নিখুঁত হ'তে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর অন্যত্র বলছেন: কবিরাজের ঘরে কতকগুলি গুড়ের কলসী ছিল। একজন চিকিৎসা করাতে এলে তিনি তাকে অন্য দিন আসতে বললেন। সে পরের দিন এলে তাকে বললেন, গুড় খেও না। একজন লোক কবিরাজের ঘরে দুদিনই উপস্থিত ছিল। সে বললে, এ ব্যবস্থা তো সেদিনই দিতে পারতে। আবার এ লোকটাকে এত হাঁটালে কেন? কবিরাজ বললেন, সে দিন এ ঘরে গুড়ের কলসী ছিল। গুড় খেতে বারণ করলে সে ভাববে, উনি নিজে গুড় খাবেন, আমার বেলা নিষেধ। এটি চলে না। আচার্য যিনি হবেন, তাঁকে অন্তরে বাহিরে ত্যাগ করতে হবে। যে কেবল মুক্তি চায়, তাঁর মনে ত্যাগ করলেই হবে।

অবশ্য যে অন্তরে বাইরে ত্যাগ করে, সে কি আচার্য হবে ভেবে ত্যাগ করে? তা নয়।' মানুষের অন্তর থেকে সংস্কার-বশে প্রেরণা আসে। গৃহস্থদের ঠাকুর বলছেন, মনে ত্যাগ করলেই হবে। সকলকেই ত্যাগী হ'তে বললে বৌদ্ধধর্মের মতো হয়ে যাবে। বৌদ্ধ-ধর্মে সকলেই সংসারত্যাগী হ'তে গিয়ে আদর্শ বিকৃত হ'ল, অবনত হ'ল। সকলের সংস্কার এত প্রবল নয় যে, সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাবে।

এজন্য ঠাকুর গৃহীদের বলছেন, বিচারপূর্বক সংযমের সঙ্গে ভোগ কর। কেউ যদি বলে, বিচারপূর্বক ভোগের কি প্রয়োজন? তাদের বলছেন, কি দরকার, কোরো না। সেজন্য, তাঁদের প্রতি উপদেশ আপাত-দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ মনে হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কেউ বলছে 'মা, আমি বিয়ে ক'রব ?'—'করবে বৈকি বাবা, এ সংসারে সবই দুটি দুটি'। বিয়ে না করলেই কি ভগবান লাভ হ'য়ে গেল ? আবার, কেউ বললে, 'মা, আমার সংসারে যেতে ইচ্ছে হয় না।'—'সত্যি কথাই তো। সংসারে আছে কি ?'—আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে দুটি বিরুদ্ধ কথা। তা নয়। যার পেটে যা সহ্য হয়, মা সেই ভাবে মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল রান্না ক'রে তাকে তাই দেন। শাস্ত্রও জননীর মতো হিতকারী, যার যা অনুকূল সে তাই বেছে নেবে।

মনে দ্বন্দ্ব রাখতে নেই। তা হ'লে যন্ত্রণার শেষ থাকবে না। ঠাকুরের কথায় ঢোঁড়া সাপের ব্যাঙ ধরার মতো অবস্থা হবে। সংসারকে অন্তরের সঙ্গে নিতেও পারে না, আবার ছাড়তেও পারে না, শাস্ত্র এই দ্বিধার ভাব নিয়ে চলতে বলেন না। শাস্ত্রে তাই অধিকারী-বিচারের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যে শঙ্করাচার্য বৈরাগ্যের কথা এত ক'রে বলছেন, তিনিই সন্ন্যাসের ধারা কেমন হবে, এ-প্রসঙ্গে বলছেন—কেউ সন্ন্যাস চাইলে বলবে, বাবা এ বড় কষ্টকর পথ, এ পথে এস না। সংসারে থাকো, সেখানে ভগবান লাভ হবে। তবু যদি কেউ জোর করে, তখন বলবে, বদরিকাশ্রম ঘুরে এস।' ভিক্ষে ক'রে পায়ে হেঁটে ঘুরে আসতে অন্ততঃ বছর-খানেক লাগত তখন। তারপরও যদি সন্ন্যাস চায়, বৈরাগ্য প্রবল থাকে, আদর্শচ্যুত না হয়, তখন তাকে অন্যদিক দিয়ে উপযুক্ত কি না বিচার ক'রে সন্ন্যাস দেবে। তার মানে, অধিকারী-বিচার ক'রে ঠিক করতে হবে।

'অধিকারিণমাসাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ'—যে অধিকারী সেই ফলের সিদ্ধি লাভ করতে পারে। অনধিকারী নয়। শাস্ত্র বলছেন, এ পথ কঠিন। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের মতো। যেতে যেতে পা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যাবে।

অবশ্য কেবল ত্যাগীর নয়, সংসারীর পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ঠাকুর বলছেন, বীরের কাজ। এত দায়িত্ব ক্লেশ বহন ক'রে ভগবানে মন স্থির রাখা, একি সোজা কথা? তিনি বলছেন, সর্বত্যাগী যদি ভগবানের চিন্তা না করে, তাকে ধিক্। যারা সংসারের বোঝা মাথায় নিয়ে ভগবানের দিকে চলেছে, তাদের তারিফ করেছেন—অহো ভাগ্য তার। এই বীরত্বের ভাবটি নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংসারে প্রবেশ করতে হবে। এই পথে যাবার সময় দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে, এই পথেই আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

চাঁদের কলঙ্ক যেমন তার সৌন্দর্যের কোন হানি করতে পারে না, তেমনি জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে থাকলে জ্ঞান তাতে প্রতিহত হয় না।

এর পর বলছেন, "পূর্ণ জ্ঞান হ'লে পাঁচবছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না।" জনক-রাজার সভায় ভৈরবী এলে, তিনি মাথা হেঁট করেছিলেন। ভৈরবী বললেন, 'জনকের এখনো স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধি আছে।'

শুকদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ

এই ভেদবুদ্ধি-রাহিত্যের দৃষ্টান্ত—আজন্ম সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী, দেহবুদ্ধি-রহিত শুকদেব; যিনি মাতৃগর্ভ থেকে মায়ার রাজ্যে ভূমিষ্ঠ হ'তে চাননি। এক মুহূর্তের জন্য ভগবানকে মায়া সরিয়ে নিতে হ'ল, তখন শুকদেব ভূমিষ্ঠ হয়েই চলতে শুরু করলেন। মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন পিতা ব্যাসদেব মমত্বহীন পুত্রকে সংসারে আনার জন্য পিছনে পিছনে ছুটছেন। পথের মধ্যে নগ্নদেহে স্নানরতা অপ্সরাদের যুবক শুকদেবকে দেখে লজ্জা বোধ হ'ল না। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে দেখে, তারা দেহ আবৃত ক'রে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। বিস্মিত ব্যাসদেব এর কারণ জানতে

চাইলে তাঁরা বললেন, জ্ঞানী এবং বৃদ্ধ হয়েও আপনার স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান আছে। শুকদেব ভেদজ্ঞান-রহিত, তাই তাঁকে দেখে লজ্জা হয়নি।

পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের অধুনাতম এক দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁর স্ত্রীভক্তেরা বলেছেন, তাঁকে দেখে কোনদিন পুরুষ ব'লে মনে হয়নি। পুরুষ ভক্তেরা যেমন ঠাকুরকে তাঁদেরই একজন মনে করতেন, স্ত্রীভক্তেরাও সেই রকম মনে করতেন। যিনি সম্পূর্ণ দেহবুদ্ধিবিবর্জিত পাঁচ-বছরের শিশু, তাঁকে দেখে কারো কি কোন সংকোচ আসতে পারে?

ঠাকুর এবার বলছেন, "কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি।" তাঁরা সংসারে থেকেছেন, লোকশিক্ষার জন্য, স্বার্থবুদ্ধিতে নয়। পরমানন্দরূপ অমৃত আস্বাদন ক'রে নিজেরাই শুধু তৃপ্ত হননি। জগৎকে তার অংশ দেবার জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার।

উনিশ

কথামৃত—১।১৫।২

জ্ঞান ও ভক্তি

যে সব ভক্ত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁরা ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করেন, তদনুসারে তিনি তাঁদের ফলদান করেন। তাঁর সগুণভাব না মানলে এ-সব ভাবা যায় না। নির্গুণ যিনি, তাঁর কাছে 'ভক্তি, ভক্ত' বলে কিছু থাকে না। তাই ব্রাহ্মসমাজ সগুণ নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী। ডাঃ সরকারও সেই ভাবের, তবে তাঁর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, বিচার-বুদ্ধির অবকাশ তাতে আছে। তিনি বিশেষভাবে বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক, কিছু জানতে হ'লে যাচিয়ে বাজিয়ে নেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তায় এখানে সেই ভাবটি প্রকাশিত। ভক্তি-ভাবকে তিনি রহস্য ক'রে বলছেন, "জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তি দরকার হয়।" জ্ঞানে অবাক্ হয়, কারণ ভগবানের গভীরতা ও অনন্ত ভাব-বৈচিত্র্যের বোধ হয়, অথবা জ্ঞান মন-বুদ্ধিকে অবসন্ন ক'রে দেয়, যেখানে পৌঁছবার সেখানে পৌঁছনো যায় না ; তখন ভগবানের স্বরূপ ভেবে সে অবাক্ হয়। তারপর তিনি পরিহাস ক'রে বলছেন, 'অবাক্ হয় চোখ বুজে যায়, আর চোখে জল আসে।' ভক্তির এই চিহ্নগুলি তার ভিতর ফুটে ওঠে। তাই বলছেন, ভক্তির দরকার হয়। অর্থাৎ আগে জ্ঞান, তারপর ভক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ঠাকুর তার সঙ্গে রঙ্গ করতেন। তিনি বলছেন, "ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।"

'বারবাড়ি' মানে, যতদূর বিচারের ক্ষেত্র, জ্ঞান ততদূর পর্যন্ত যেতে পারে। অন্তরের অন্দরমহল জ্ঞানের নয়, সেখানে ভক্তির প্রবেশ। বিচারকে অতিক্রম ক'রে যেখানে পৌঁছতে হয়, ভক্তির সেখানে অবাধ বিচরণ।

ভক্তিবাদে বলা হয়, ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করতে পারে। জ্ঞানী কেবল তার বাহ্য আচরণ নিয়ে বিচার করে, তাঁর রস আস্বাদ করতে পারে না। চৈতন্য-চরিতামৃতে পরিহাস ক'রে বলা আছে, ভক্ত-কোকিল প্রেমাম্রমুকুল ভক্ষণ করে, আর জ্ঞানী-কাক তিক্ত নিমফল খায়। তাতে মিষ্টি স্বাদ নেই। এটি ভক্তের দৃষ্টিতে জ্ঞানীকে উপহাস। আবার জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভক্তকে উপহাস করাও হয়েছে। ঠাকুরকে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে দেখে তোতাপুরী বলছেন 'কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো?' —কারণ, এ রসের আস্বাদন তখনও তাঁর হয় নি। আবার জ্ঞানেরও যে মাহাত্ম্য আছে এবং তার দ্বারাও যে ভগবানকে আস্বাদন করা যায়, ভক্তেরা তা অনুভব করেন না। অনুভব না করার যুক্তিও আছে। জ্ঞানী বলেন, 'আমি ব্রহ্ম'। যে ব্রহ্ম সে ভগবানকে কি ক'রে আস্বাদ করবে? রামপ্রসাদের গানে আছে, চিনি হ'তে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি। ভক্তির দ্বারা তাঁর আস্বাদন করা যায়। জ্ঞানে ভগবানের সঙ্গে জ্ঞানীর কোন পার্থক্য থাকে না। সেখানে 'তুমি-আমি' ভেদ থাকে না। আস্বাদনের জন্য দুটি থাকা দরকার। জ্ঞানী ভক্তকে পরিহাস ক'রে বলে, ভক্ত কিছুই বোঝে না, শুধুই হাপুস নয়নে কাঁদে। স্বামীজীও এ-রকম পরিহাস করতেন অনেক সময়। অবশ্য এ-রকম দুটি একটি কথা দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। তাঁর বাহির জ্ঞানের আবরণে ঢাকা, ভিতর ভক্তিময়। নিজেও কম কাঁদেন নি। কিন্তু ঠাট্টা ক'রে বলতেন, খালি কান্না, কান্না। শাস্ত্র অধ্যয়ন, বেদ-বেদান্তের চর্চা করতে হবে, ন্যায় শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, তবে তো ভগবানের তত্ত্ব সম্পর্কে একটু জানবে। তা নয়, কেবল কান্না। পেল্লাদের দল সব!

কিন্তু একজন অপরের পথ অনুসরণ না ক'রে মন্তব্য করছে—এইটিই ভ্রম। কিন্তু কেউ যদি জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে তারপর মন্তব্য করেন, তা হ'লে তা গ্রাহ্য হয়। কিম্বা ভক্তির চরমে পৌঁছে তারপর ভক্তির সম্বন্ধে কটাক্ষ করলে, তার মূল্য থাকে ; একে অন্যের পথ না জেনে মন্তব্য করলে তা মূল্যহীন পরিহাসমাত্রে পর্যবসিত হয়।

ঠাকুর জ্ঞান-ভক্তি সম্বন্ধে পরিহাস ক'রে বলার পর ডাক্তার কটাক্ষ করছেন, "কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না।" অর্থাৎ ভক্তির আতিশয্যে ভগবানের সম্পর্কে নিছক কল্পনা ক'রে হাপুস নয়নে কাঁদার কিছু নেই। বিচার ক'রে দেখ। ভক্তির যারা ঐরকম আতিশয্য দেখায় স্বামীজী তাদের ঠাট্টা করেছেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে যাকে ভক্তি ক'রব, তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু জানা না থাকে, তো কাকে ভক্তি ক'রব? একজন বলছে, 'আমি জ্ঞান চাই না, শুদ্ধা ভক্তি চাই।' ঠাকুর প্রশ্ন করছেন, 'সে কিরে, যাকে ভক্তি করবি, তাকে না জানলে, কি ক'রে ভক্তি করবি?'

কথাটি অত্যন্ত সমীচীন ও সহজবোধ্য। ভক্তির পাত্র যিনি, তাঁর সম্বন্ধে কিছু না জানলে ভক্তি হবে কি করে? সুতরাং তাঁকে জানতে হবে। ভক্তি শাস্ত্রও বলেছেন, সাধ্য—সাধনতত্ত্ব জানবে। ভক্তিশাস্ত্রে তাই স্বাধ্যায়, পাঠ, বিচার আছে। বস্তুতঃ, আমরা মানুষ, বিচার-বুদ্ধির প্রতি প্রবণতা আমাদের সহজাত। ভক্ত হলেও পথটা যে ঠিক পথ, তা বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্ততঃ জ্ঞানের বেড়া না দিলে ভক্তি টিকতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয়, ভক্তিপ্রাধান্যের দেশ বাংলাতে ন্যায়শাস্ত্র সবচেয়ে উন্নত ও প্রভাবশালী হয়েছে। যদিও মিথিলায় প্রাচীন ন্যায়ের জন্ম, কিন্তু তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে নবদ্বীপে নব্যন্যায়রূপে। সে তর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারায় অসাধারণ পণ্ডিতেরও মাথা গুলিয়ে যায়। ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতরা বেদান্তী ছিলেন

না, ভক্ত ছিলেন। ন্যায়ের সাহায্যে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত তাঁরা খণ্ডন করেছেন। বেদান্তীও আবার তাঁদের খণ্ডন করেছেন। এইভাবে গড়ে উঠেছে বিশাল দর্শনশাস্ত্র। যাঁরা ওসবে শক্তিক্ষয় না ক'রে তত্ত্বকে আস্বাদন করতে চান, তাঁরা জ্ঞানী বা ভক্ত যাই হ'ন—তাঁদের অত বিচার করতে হবে না। ঠাকুর বলেছেন, 'নিজেকে মারার জন্য একটা নরুন হলেই হয়, অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে ঢাল, তলোয়ার দরকার।'

স্বসিদ্ধান্তে নিষ্ঠা

আসল কথা, আমরা যে সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রব, তাতে দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই। সেই বিশ্বাস কারো সহজাত, আবার কেউ হাজার বিচার ক'রেও সে বিশ্বাস দৃঢ় করতে পারেন না। এই বিশ্বাস ধর্মপ্রবৃত্তির গভীরতার উপর নির্ভর করে। যদি শুদ্ধমন হয়, "তুমি ব্রহ্ম" এই গুরু বাক্য শুনলেই তক্ষুণি অনুভব হ'য়ে যাবে, 'আমি ব্রহ্ম'। বিচার ক'রে আর দেখতে হবে না, এক কথায় জ্ঞান হ'য়ে যায়। বেদান্তবাদীরা বলেন, ভাষা যদি একজন বোঝে, তবে তার 'তুমি ব্রহ্ম', এই এক কথায় জ্ঞান হ'য়ে যাবে। এই গুরু বাক্যটি সহজ, কিন্তু এই সহজ-বাক্যটি বোঝাবার জন্য হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তবু এখনও কিছু কিনারা হ'ল না। কারণ বিশ্বাস সহজে হয় না। এই বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্য জ্ঞানী তাঁর বিচারের ধারাকে ও ভক্ত তাঁর ভক্তিশাস্ত্রকে বাড়িয়ে চলেছেন। যাঁরা রসাস্বাদ করতে চান, তাঁরা অত যুক্তি বিচারের ভিতর যান না। আমরা এই জগৎটাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, অথচ দার্শনিক বলেছেন, জগৎ নেই! তখন কি আমরা ভাবি, তাই তো কি হবে? কোথায় দাঁড়াব? আমরা তখন তাকে উপহাস ক'রে বলি, ও ভাব-রাজ্যে আছে। ঠিক সেইরকম ভগবানের সত্তায় যাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসী অত

যুক্তির তাঁদের প্রয়োজন নেই, তাঁরা তাঁকে অনুভব করেছেন, আস্বাদন করেছেন।

অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান

এ সম্পর্কে বেশ একটি কথা আছে। জ্ঞানীর ব্যবহার কি ক'রে হয় —এই প্রশ্ন উঠেছে। জ্ঞানীর জ্ঞান দ্বারা জগৎ সংসার লয় হ'য়ে যায়, তারপর তাঁর ব্যবহার কি ক'রে হবে? অদ্বৈতবাদী এ-বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু বিষয়টি কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'দৃষ্টেন অনুপপন্নং নাম'—যা দেখা যাচ্ছে, তা আবার অযৌক্তিক কি ক'রে হবে? তাকে অযৌক্তিক বলার কোন অর্থ নেই। যুক্তি দুর্বল, প্রত্যক্ষ প্রবল। জ্ঞানী ব্যবহার করছেন, এ তো দেখাই যাচ্ছে, সুতরাং তাঁর ব্যবহার সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নই ওঠে না।

প্রত্যক্ষই আসল ভিত্তি, বিচার তার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইরকম জ্ঞান বা ভক্তি যার ভিতর দিয়েই হ'ক, যিনি ভগবানকে আস্বাদন বা অনুভব করেছেন, তাঁর আর যুক্তির সাহায্যে সেই অনুভবকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে না। তিনি এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়। কিন্তু যার সংশয় আছে, যে প্রতিষ্ঠিত নয়, তার পক্ষে যুক্তির সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ পথিকের কাছে যুক্তির প্রয়োজন, কিন্তু, যিনি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন—জ্ঞানী বা ভক্ত যেই হ'ন—তাঁর আর যুক্তির দরকার নেই।

একজন হিন্দুস্থানী জ্ঞানী সন্ন্যাসীর কথা শুনেছি। তিনি শাস্ত্র পড়াবার সময় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যখন বলতেন, বিভোর হয়ে বলতেন। 'এ সব ভরা হুয়া হ্যায়' বলতেই তাঁর সমস্ত মুখে যেন একটা জ্যোতি খেলে যেত। এইটি হ'ল অনুভবের শক্তি। কারো প্রত্যক্ষ অনুভব হ'লে তবে তিনি এভাবে বলতে পারেন। ভক্তির সম্বন্ধেও তাই; তোতাপুরী ভক্তি অনুভব করেন নি, তাই বলছেন, 'কেঁও রোটি ঠোক্তে

হো'? ঠাকুর হাসছেন এই ভেবে যে, তোতাপুরীর এই ভক্তি বিষয়ে অনুভব নেই। তাই বুঝতে পারছেন না।

ঠাকুর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আবার ভক্তির সারও আস্বাদন করেছেন; দুটিই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট, তাই হাসছেন অত বড় জ্ঞানী তোতাপুরীর অসম্পূর্ণতা দেখে। আমাদের মনে রাখতে হবে সেই বহুরূপীর কথা। ভগবানের বহু রূপ। যে ঐ গাছতলায় থাকে, সেই বোঝে তিনি এ-ও, ও-ও; আবার আরো কত কি! ঠাকুর বলছেন, তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, আবার তারও পারে। তিনি এ-সব বলছেন কেন? সাকার নিরাকার—এগুলি আমাদের যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে একটা শব্দ প্রয়োগ করা মাত্র। ভগবান সম্বন্ধে শব্দ প্রয়োগ করছি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে। আমাদের বুদ্ধি ভগবানের পূর্ণ স্বরূপকে বোঝাতে পারে না। ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়—ছোট ছেলে খুড়ী-জেঠীর ঝগড়ার সময় 'ঈশ্বরের দিব্য' বলতে শুনেছে, তাই বলছে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য।' ঈশ্বর কি জানে না, কোন অভিজ্ঞতা নেই তার কাছে, 'ঈশ্বর' শুধু শব্দ মাত্র।

তিনি যদি সাকার হ'ন, তা হ'লে নিরাকার এবং নিরাকার হ'লে সাকার কি ভাবে হবেন? দুটি পরস্পর-বিরোধী কথা। কিন্তু এক জায়গায় এই বিরোধের যে অবসান হ'তে পারে, তা সাধারণ মানুষের বিচারশক্তির অগম্য। আমাদের বিচারবুদ্ধি যতদূর যায়, ততদূরই তাকে নেওয়া যেতে পারে এবং তাও যে একেবারে অসার্থক, তা নয়। ঠাকুর বলছেন, যে ভগবানের স্বরূপ বা তত্ত্বকে না-ও জানে, যদি তার ভক্তি থাকে, সেই ভক্তির সাহায্যে সে তত্ত্ব অনুভব করতে পারে, যদিও তার বিচার বুদ্ধি না থাকে।

গীতাপাঠের সময়ে একজনকে অঝোরে কাঁদতে দেখে শ্রীচৈতন্যদেব প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' সে বললে, 'আমি কিছুই বুঝি

না, শুধু দেখছি, ভগবান রথে ব'সে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাই কাঁদছি।' তার ভক্তির ভিতর দিয়েই ভগবান প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছেন। আবার পণ্ডিত গীতার নানা ব্যাখ্যা ক'রে চলেছেন নানা যুক্তি-তর্ক বিচারের সাহায্যে, তিনি হয়তো কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেন না। বিশ্বাস গাঢ় হ'লে সাধককে তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। ঠাকুর বলছেন, কেউ পূর্ব দিকে যেতে চায়, কিন্তু পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে ; আবার কেউ তাকে পথ বলে দেয়, 'এ পথ নয়, ঐ পথে যাও।' পথ বদলে সে তখন সেদিকে গেল। তবে আগ্রহটি থাকা চাই। মানুষ যদি তত্ত্বান্বেষী হয়, তা হ'লে ভুল-ভ্রান্তি হলেও ধীরে ধীরে সে গন্তব্যে পৌঁছয়। আর বিচার করলেই যে ভুল হয় না, তাও নয়। বিচার হয়-কে নয়, নয়-কে হয় করে। বিচার এমন ভাবে করে যে, তা হয়তো শুদ্ধ নয় ; তত্ত্বকে জানার জন্য নয়। বিচার তত্ত্বে পৌঁছতে সাহায্য করে, কিন্তু তার উপর পূর্ণ নির্ভর করা যায় না।

ঠাকুর বলছেন, একজন ভুল পথে গিয়েছিল, ভুল ভেঙে গেলে আবার সে ঠিক পথে গেল। ডাঃ সরকার তখন বলছেন, "সে ভুলে তো গিছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, "হাঁ তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।" আগেই বলেছেন, জ্ঞানীও পথ ভুল করে। কাজেই এ প্রশ্ন নয়। তবে একটি কথা ঠাকুর বলেছেন, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' ভক্ত হলেই যে বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

আত্মবিচার

আমরা ভাবি ভগবানের দিকে যাচ্ছি—হয় চোখ বুঁজে, নয় মালা ঘুরিয়ে। কিন্তু যাচ্ছি কি না, এটা কি পরিষ্কার ক'রে দেখি? ঠাকুর বলছেন, 'যখন চাল কাঁড়ে, মাঝে মাঝে তুলে দেখতে হয়, কাঁড়া ঠিক হ'ল কি না?' সাধন-পথে আত্মবিশ্লেষণ দরকার। মাঝে মাঝে দেখতে

হবে, আমি ঠিক করছি কি না? যদি শুধু বলা যায় 'ক'রে যাও, ক'রে যাও', সেটা যুক্তিযুক্ত কথা নয়। ভগবানলাভ সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। সেই অনুসারে মাঝে মাঝে বিচার ক'রে দেখতে হবে, এগোচ্ছি কি না? এগোলে ক্রমশঃ লক্ষ্য নিকটতর হবে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করছেন। একজন বলছেন, এই পথে নিশ্চয়ই গিয়েছেন, কারণ তাঁর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। এই যে গায়ের গন্ধ পাওয়া—কৃষ্ণ-গন্ধ পাওয়া—এইটি হচ্ছে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। নিজেকে বিশ্লেষণ না করলে কেউ বুঝতে পারবে না, ঠিক ঠিক এগোচ্ছে কি না। বিচারের সার্থকতা এখানে। বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে বিচার বস্তু নির্ণয়ে সমর্থ হবে, না হ'লে সে বিচার মূল্যহীন। ঠাকুর বলছেন, বড় বড় পণ্ডিত—যদি দেখি বিবেক-বৈরাগ্য নেই, তাদের খড়কুটো মনে হয়।

ঈশ্বর বৈচিত্র্যময়

ঠাকুর ডাঃ সরকারকে বলছেন, "কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন?" ডাঃ সরকার মাঝে মধ্যে টিপ্পনী দিচ্ছেন। ঠাকুর সেগুলির মধ্যে মূল্যবান কিছু থাকলে আলোচনা করছেন, না হ'লে ছেড়ে যাচ্ছেন। উপসংহারে ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না।" সাধককে তিনি নানা ভাবে নানা রূপে দেখা দেন। ঠাকুর গামলার রঙের সুন্দর উপমাটি দিলেন। একজনের এক-গামলা রঙ ছিল। যে যে রঙ চাইছে, সেই একই গামলায় ডুবিয়ে তার কাপড় সেই রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ভগবান ভক্তকে কৃপা করেন বহুরূপে, যে যে ভাবে চায়। কেউ অরূপ চাইলে তাও দেন। তাঁর এই বৈচিত্র্য বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, সে বৈচিত্র্য অনুভবগম্য। যাঁরা তাঁকে এক রূপে নয়,

বিবিধরূপে অনুভব করেছেন, তাঁরাই এ-কথা বলতে পারেন। ঠাকুর বহুরূপীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন, ভগবানের সর্বরূপের অনুভব না হ'লে সে অপূর্ণ থেকে যায়। তোতাপুরী সম্বন্ধে বলতেন, তাঁর ব্রহ্মানুভূতি হয়েছে, নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু ভক্তের আস্বাদ্য ভগবানের বিচিত্র রূপ সম্বন্ধে তিনি একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সে অপূর্ণতা দূর হয়েছে। এ অপূর্ণতা ভক্ত, জ্ঞানী নির্বিশেষে স্বাভাবিক। ভক্ত বলেন, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভগবানের ভিতর বৈচিত্র্য নেই, কারণ তাঁরা দূর থেকে তাঁকে দেখেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, দূর থেকে সূর্যকে একটি অগ্নিগোলকের মতো দেখায়, কিন্তু সূর্যলোক-বাসী তার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য দেখে। জ্ঞানীও বলেন, ভক্তের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ ; মানুষের বুদ্ধির অপূর্ণতার জন্য ত্রুটি হয়।

ঠাকুর বলছেন, একটা রূপ আস্বাদন ক'রে যদি ভরপুর হ'য়ে যাও, তা হ'লে তোমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু অপরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে তা পরখ ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি বার বার বলেছেন, নিজের মতের প্রতি নিষ্ঠাবান্ হও, আবার অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, অথবা নিজের অজ্ঞতা স্বীকার কর। অযথা অপরের সমালোচনা করা উচিত নয়।

কুড়ি

কথামৃত—১৷১৫৷২

শ্যামপুকুরের বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবিরাম ঈশ্বরপ্রসঙ্গ চলছে। সাকার-নিরাকার দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা হ'তে হ'তে ঠাকুর গভীর তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছেছেন। বলছেন, "'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ-টুপ উড়ে যায়।" অর্থাৎ তখন সাকার নিরাকারে পৌঁছায়। বিচারের পর সমাধি—এ বিষয়টি সম্বন্ধে যোগী ও জ্ঞানীদের একটু মত-পার্থক্য আছে। সুষুপ্তিকালে বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হ'লে মানুষের যেমন হয়, সমাধি-অবস্থাতেও তেমনি বাইরের কোন ব্যবহার থাকে না, শরীর মন কাজ করে না। বিচারের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় এবং 'একমাত্র ব্রহ্ম সত্য'—এই বুদ্ধি যদি স্থির হয়, তাহলে জ্ঞানীর চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো হ'ল। জ্ঞানীর লক্ষ্য হ'ল, ব্রহ্ম ছাড়া আর সব মিথ্যা—এই তত্ত্বটি স্থির ভাবে বোঝা। তাহলে ব্রহ্মকে আর নতুন ক'রে বুঝতে হয় না, কারণ ব্রহ্ম তো মানুষের সত্তাস্বরূপ। ব্রহ্মের উপর যা কিছু আবরণ পড়েছে, তা মিথ্যা ব'লে জানলে জ্ঞানীর কাজ শেষ হ'ল। এই জ্ঞানের পরিণামে যে সমাধি হবেই, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি যে তার কাজ থেকে বিরত হবেই, এমন কোন কথা নেই।

আমরা 'সমাধি' বলতে সাধারণতঃ যোগী বা ভক্তের ভাবসমাধির কথা মনে করি। ভাবসমাধিতে ভক্ত যখন ভগবানে মনকে লীন ক'রে দেয়, তখন তার বাহ্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হ'য়ে যায়। যোগীর মতে চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করাই যোগ এবং চিত্ত বৃত্তিশূন্য হ'লে দেহ ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায় কারণ মনের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া এগুলি কাজ করতে পারে না।

যোগীরা একেই সমাধি বলেন। 'সমাধি' শব্দের অর্থ সম্যক্ রূপে আধান বা স্থাপন।

যোগী জ্ঞানী ও ভক্তের সমাধি ভিন্ন ভিন্ন রকমের,—তিনটি এক নয়। যোগী চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করলে বৃত্তির কাজ 'আমি, আমার'-বুদ্ধি ওঠে না। অহংমমাকারা বৃত্তি বন্ধ হ'য়ে গেলে শরীরাদি পরিচালনা করার কেউ থাকে না, সব নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায়। এই হ'ল যোগীর সমাধি।

ভক্ত ভগবানে মনোনিবেশ করতে করতে সেই ধ্যেয় বস্তুতে এত নিবিষ্ট হ'য়ে যান যে, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির দিকে আর তাঁর মন যায় না। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদিও নিশ্চল হ'য়ে যায়—এ হ'ল ভক্তের সমাধি। অর্থাৎ তফাত হচ্ছে যোগী মনকে বৃত্তিশূন্য করেন, আর ভক্ত উপাস্যে মনকে নিবিষ্ট করেন। অবশ্য জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগীর সমাধির বিভিন্ন স্তর আছে।

ভক্ত ও যোগীর সমাধির পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর জ্ঞানীর সমাধি? জ্ঞানীর সমাধি হ'ল তাঁর স্বরূপেতে স্থিতি। জ্ঞানীর সমাধিতে দেহেন্দ্রিয়াদির 'আমি, আমার' বুদ্ধি থাকবে না। এখন সে বুদ্ধি না থাকায় দেহেন্দ্রিয়াদি কাজ করবে কিনা, তার উত্তরে জ্ঞানযোগী বলেন, করতে পারে, আবার না-ও করতে পারে। যদি করে, তাহ'লে বুঝতে হবে—পূর্ব কর্মের ফল। যাকে এখানে প্রারব্ধ বলা হচ্ছে, সেই প্রারব্ধই কর্মের হেতু। কারণ 'আমি' বলে বস্তুটি সেখানে থাকে না, থাকলেও আমিত্বের একটা আভাস মাত্র থাকে। সেই আভাসটি পূর্বাভ্যাসবশতঃ আসে, কিন্তু সে কর্মে তাঁর কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না। সব করছেন অথচ আমিত্ববুদ্ধি নেই। গীতায় ভগবান এটা বিশেষ করে দেখিয়েছেন, 'হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।'

এই যে কর্ম করেও কর্ম করছেন না, এইটি জ্ঞানীর অবস্থা।

'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ'—দেহে থেকেও দেহে নেই। অর্থাৎ দেহের ব্যবহার যখন আছে, তখন আমরা বলি—এ-ব্যক্তি জ্ঞানী এবং সেই দেহতেই জ্ঞানলাভ করেছেন। কিন্তু 'দেহে নেই' মানে এইটি আমার দেহ—এই মমত্বাভিমান তাঁর নেই। তিনি জেনেছেন, এ-সব মিথ্যা। এই মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় জ্ঞানের পরিণাম। এইটিকে আমরা 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকার' বলি। কিন্তু কথাটির ভিতর ত্রুটি আছে। জগতের অন্য জিনিসকে যেভাবে দেখি, সেইভাবেই ব্রহ্মকে দেখলে সাধারণ অর্থে 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকার' বলা যায়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকার' মানে ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচর করা। চক্ষু সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ, অর্থাৎ চোখ বলতে কেবল চোখ নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বোঝাচ্ছে। তার দ্বারা যে অনুভব, তার নাম সাক্ষাৎকার। কিন্তু ব্রহ্ম তো ঘট পটের মতো বাহ্যবস্তু নয় যে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখব। সুতরাং এখানে 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকার' মানে বুঝতে হবে যে, ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার জন্য মাঝখানে কোনও করণ অথবা উপাধি নেই। আমরা চোখ দিয়ে কোন বস্তু দেখলে সে বস্তুর সঙ্গে চোখের সংস্পর্শ হয় এবং সেই সংস্পর্শ মনে বৃত্তি সৃষ্টি করে। মনের বৃত্তি আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলে বস্তুর অনুভব হয়। দার্শনিকদের মতে বস্তু অনুভবের এটি প্রণালী। তা হ'লে বস্তু সাক্ষাৎকার করতে গেলে ইন্দ্রিয় মন ছাড়াও তার সহকারী কারণ যেমন আলো, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদির দরকার। এই সহকারী কারণগুলি ছাড়া বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কি রকম ক'রে হয়? সেখানে ব্রহ্মকে নির্বাধভাবে অনুভব—অর্থাৎ কোন অন্তরাল বা ব্যবধান মাঝখানে থেকে যে সেই অনুভব হচ্ছে, তা নয়। এই স্ব-স্বরূপের অনুভূতি—ঠাকুর যাকে বলতেন 'বোধে বোধ হওয়া' এই হ'ল ব্রহ্মানুভূতি। এ অনুভূতি হ'লে জ্ঞানীর সমাধি হয়। তাতে যে দেহের নিষ্ক্রিয়তা আসবেই এমন নয়।

যদি দেহ কাজ করতে থাকে এবং জ্ঞানী যদি তাতে তাঁর অহংকে লিপ্ত না করেন, তা হ'লে তিনি সমাধিস্থ। সে অবস্থায় তাঁর অভিমান থাকে না, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হ'তে পারে। এই হ'ল জ্ঞানীর সমাধি।

আর ভক্তের সমাধি? যে বস্তুতে মনকে কেন্দ্রীভূত করছে, সে বস্তু ছাড়া যখন অন্য বস্তুতে মন যায় না, তখন হয় ভক্তের সমাধি। তার বাহ্য, অর্ধবাহ্য আর অন্তর্দশা—এই তিনটি ভাগ আছে। যখন মন ঈশ্বরমুখী হয় এবং ব্যবহারও তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন বাহ্যদশা। আর যখন বাহ্য ব্যবহার লোপ পায় অথচ বাহ্যসংজ্ঞা একেবারে লুপ্ত নয়, তখন তাকে বলে অর্ধবাহ্যদশা। মনটা বেশীর ভাগ অন্তরে টানা রয়েছে, একটু একটু বাইরে আভাস আছে। তারও পরে অন্তর্দশায় বাহ্য ব্যবহার সমস্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। এই দশার সঙ্গে সমাধির সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ হলেও যোগীর সমাধির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। কারণ ভক্ত নির্গুণ নিরাকারের নয়, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে, কিংবা নির্গুণের উপাসনা করলেও নিজেকে একেবারে লীন ক'রে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে উপাসনা করে না।

ভক্ত ও ঈশ্বর

ঠাকুর এখানে যে বললেন, এইভাবে সমাধি অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরেতে স্থিতি হ'লে রূপ টুপ উড়ে যায় অর্থাৎ তাদের সম্বন্ধে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না, এটি গভীর দার্শনিক কথা। ভক্ত ভগবানকে ব্যক্তিরূপেই চিন্তা করে, দেখে। ব্যক্তিত্ব বলতে বস্তুর এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক্ ক'রে, তার চারপাশে যেন একটা গণ্ডী টেনে দেয়। ঈশ্বরকে যতক্ষণ পৃথক্‌রূপে দেখি, ততক্ষণ তাঁর এই গণ্ডী টেনে দেওয়া ব্যক্তিত্ব থাকে। কিন্তু যখন

ঈশ্বর ছাড়া আর কোন প্রতীতি হচ্ছে না, তখন ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বও থাকে না। ঈশ্বরকে ঈশিতা বা নিয়ন্তা বলা হয়। জগৎ-নিয়ন্তা ব'লে তিনি ব্যক্তি, কারণ যার নিয়ন্ত্রণ করছেন, তা থেকে তিনি পৃথক্। কিন্তু জগৎ ব'লে যদি কিছু না থাকে, তখন তিনি কার নিয়ন্ত্রণ করবেন? তখন তাঁর ঐশ্বর্য কোথায় রইল? সুতরাং তখন তিনি আর ঈশ্বর নন, তাঁকে 'ব্যক্তি' বলা যায় না।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন উঠবে, তাহ'লে তিনি কি? ঈশ্বরের লক্ষণগুলি তাঁতে প্রযোজ্য না হ'লে কি ভাবে তাঁকে প্রকাশ ক'রব? তাঁকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করি, তিনি সর্বাত্মা, সর্বেশ্বর, সর্বত্র তিনি অনস্যূত হ'য়ে আছেন। সকলকে তিনি চালাচ্ছেন। এ-সব নিবৃত্ত হ'লে তাঁকে বুঝব কি ক'রে? কি ভাবেই বা প্রকাশ ক'রব?

ঠাকুর তার উত্তর দিচ্ছেন, "তিনি কী মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই।" ঠাকুরের সেই নুনের পুতুলের সমুদ্র-মাপার সুন্দর দৃষ্টান্তটি এখানে সার্থকভাবে প্রযোজ্য। সমুদ্র লবণময়, নুনের পুতুলটিও তাই—তত্ত্বতঃ এক অথচ পৃথক্। এক জায়গায় তরল ব্যাপক, আর এক জায়গায় একটি ঘনীভূত রূপ নিয়েছে। এই রূপবিশিষ্ট ব্যক্তিটি অরূপ সমুদ্রের পরিমাপ সম্বন্ধে গবেষণা করছে। সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে সে গলে গেল, তার নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব আর রইল না। তখন কে বলবে সমুদ্র এত গভীর, এত লম্বা, এত চওড়া? আমরা আমাদের সীমিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের স্রষ্টা, নিয়ন্তা যে তত্ত্ব, তার অনুসন্ধান করছি, তার সম্বন্ধে সত্যে পৌঁছতে যাচ্ছি। এই পথে যেতে যেতে আমাদের স্বরূপের ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে—হ'তে হ'তে এমন অবস্থায় পৌঁছলাম, যখন আমাদের 'আমি' আর রইল না, গলে গেল। তখন আর ব্রহ্মস্বরূপের আলোচনা করবে কে?

কথাটি খুব গভীরভাবে অনুধাবন করার মতো। আমরা ব্রহ্ম হ'য়ে যাই। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মই হ'য়ে যান। 'ভবতি' বা হ'য়ে যান কথাটির অর্থ কি ব্রহ্মরূপেতে পরিণত হওয়া? তা নয়। স্বরূপতঃ সে ব্রহ্মই ছিল, কিন্তু নিজেকে তার থেকে পৃথক্ ব্যক্তিরূপে সে বোধ করেছে এবং তার থেকে ভিন্ন এক ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করেছে। এই চিন্তা করতে করতে তার মনের শুদ্ধি হ'তে থাকে, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণাও বদলাতে থাকে। ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসে যে, তার ব্যক্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। তখন সে তার ঈশ্বরকে পৃথক্‌রূপে ভাবতে পারে না। সুতরাং সে ঈশ্বরস্বরূপ হ'ল, যা ছিল তাই রইল, তার ভিতর কোন পরিবর্তন ঘ'টল না। কেবল যে আবরণটার জন্য ঈশ্বর থেকে নিজেকে ভিন্ন ব'লে মনে হচ্ছিল, সেই আবরণটি স'রে গেল, পৃথক্‌ত্বের ভ্রান্তি দূর হ'ল। এখন ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করবে কে? এইজন্যই ব্রহ্ম কি, তা কেউ বলতে পারে না; যে বলবে সে থাকে না। ব্রহ্মকে বলবার মতো কোন লক্ষণ ব্রহ্মেতে থাকলে তিনি ব্যক্তি হ'য়ে যেতেন। কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা একজনকে ব্যক্তি বলি, যা তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে। যখন সব লক্ষণ ও গুণগুলি তার থেকে চ'লে গেল, তখন অন্যের থেকে পৃথক্ করার মতো কিছু উপাধি রইল না। তখন তাকে কি ব'লে বর্ণনা ক'রব?

ব্রহ্ম শব্দের অগোচর

এইজন্যই ঠাকুর বার বার বলেছেন, শাস্ত্রও বলেছেন, 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ'—অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হয়েছে 'অ' দিয়ে দিয়ে। তিনি এ নন, ও নন, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির গ্রাহ্য বিষয় তিনি নন। তা হ'লে তিনি কি? তিনি কি, তা মুখে বলতে না পেরে

বলা হচ্ছে, এই সমস্ত গ্রাহ্য বিষয়ের তিনি আধার। আবার গ্রাহ্য বস্তুকে ভ্রম বলা হ'লে সমস্ত ভ্রমের তিনি অধিষ্ঠান। এ-রকম একটি ভ্রমের অধিষ্ঠান স্বীকার না করলে ভ্রমকে মানা যায় না। যেমন সর্পটি ভ্রম ; কোথায় সে ভ্রম হচ্ছে ? না, রজ্জুতে। সুতরাং রজ্জুটি হচ্ছে অধিষ্ঠান, তার উপর আরোপিত হচ্ছে সর্প। তেমনি এই জগৎরূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান কি ? আমরা একটি শব্দ বলি 'ব্রহ্ম'—যার অর্থ ব্যাপক, বৃহৎ অর্থাৎ যেখানে যেখানে ভ্রম দেখছি, সেখানে সেখানে তার অধিষ্ঠান এক বস্তু। সুতরাং সর্ব ভ্রমেতে ব্যাপকরূপে রয়েছেন তিনি—এই তাঁর ব্যাপকতা। নিরপেক্ষ ব্যাপকতা নেই, ভ্রমের অপেক্ষায় তাঁর ব্যাপকতা। কাজেই ব্যাপকতাটিও তাঁতে আরোপিত। এই আরোপ যে বস্তুতে, জ্ঞানী সেই বস্তুকে জানেন। এর মানে কি ? না, অন্য সব বস্তুগুলিকে আরোপিত ব'লে জানেন। অধিষ্ঠানকে আর নতুন ক'রে জানতে হয় না। অধিষ্ঠানের জ্ঞান ছাড়া কখনও আরোপের জ্ঞান, দড়ির জ্ঞান ছাড়া সাপের জ্ঞান হয় না। দড়িকে যে দেখে না, সে সাপকেও দেখে না। ভ্রম তখনই বলি, যখন কেউ দড়িকে দেখছে দড়িরূপে নয়, সাপরূপে ; ব্রহ্মকে দেখছে ব্রহ্মরূপে নয়, জগৎরূপে। সাপকে যেমন রজ্জুতে, তেমনি জগৎকে যদি ব্রহ্মেতে লয় করা যায়, তা হ'লে যে বস্তুটি থাকে, তাকে বলি 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম বললেও এই ব্রহ্ম-শব্দের বাচক তিনি হচ্ছেন না। অন্য বস্তুগুলির সত্তা অনুভব ক'রে তাদের ভিতর তিনি ভ্রমরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন ব'লে তাকে ব্যাপক বা 'ব্রহ্ম' বলছি। শাস্ত্রে 'সচ্চিদানন্দ' আদি ব্রহ্মবাচক সব শব্দকেই এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং 'ব্রহ্ম' শব্দের অগোচর। তাই ঠাকুর বলছেন, "তিনি কি, মুখে বলা যায় না।"

'তিনি কেবল বোধে বোধ হন'

এখানে আর একটি কথা আছে। যদি তিনি সর্বব্যক্তিত্ব-রহিত হন, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অগোচর হন, তা হ'লে সেই বস্তুটিকে স্বীকার ক'রব কেন? সেই বস্তুকে কি কেউ অনুভব করেছে, কেউ না। অতএব সে যে আছে, তার প্রমাণ নেই। ঠাকুর তার উত্তর দিচ্ছেন, 'তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন।' যখন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধ বুদ্ধির স্বরূপরূপে তিনি প্রতীত হন, বিষয়রূপে নয়। বুদ্ধি তখন ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। মলিনতা থাকলে বুদ্ধি তার থেকে ভিন্ন হ'য়ে যায়, প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন কাঁচের উপর রঙ লাগিয়ে দেখলে সব জিনিস রঙীন দেখায়, ঠিক সেইরকম বুদ্ধির উপর প্রলেপ লাগিয়ে আমরা এই জগৎ ঘটপটাদি সব, আমার 'আমি' পর্যন্ত রঙীন দেখছি। কিন্তু প্রলেপটিকে ভাল ক'রে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করার পর যে বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল শুদ্ধবুদ্ধি এবং বোধে বোধ হওয়া মানে সেই শুদ্ধবুদ্ধিতে বস্তুর অভিন্নরূপে স্বপ্রকাশ অবস্থায় থাকা। তাঁকে কেউ দেখে —এ-কথা বলা যায় না; স্ব প্রকাশ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন তিনি। যেমন এক বস্তু অন্য বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত হয়, ব্রহ্ম তেমন অন্য কোন বস্তুদ্বারা প্রকাশিত হন না, নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন। কর্তৃকর্ম-বিরোধ এখানে হয় না—কারণ বিষয়রূপে নয়, নির্বিষয়রূপে তাঁর প্রকাশ।

এখানে বেদান্তের গূঢ় তত্ত্বটিকে ঠাকুর সাদা কথায় বলছেন, 'তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন।' মন বুদ্ধি সীমিত, এর দ্বারা যা ধরা যাবে, তা সীমিত হবে। মাছ ধরার জাল দিয়ে কি সমুদ্রকে ধরা যায়? জাল সমুদ্রের একাংশে পড়ে থাকে, সমুদ্র যেমন তেমনই থাকে। ব্রহ্ম অসীম, সুতরাং তাঁকে এই মনবুদ্ধিরূপ যন্ত্র দ্বারা কখনও ধরা যাবে না। তবু মনবুদ্ধির সাহায্য ছাড়া তাঁকে জানবার

চেষ্টাই বা কি ক'রে ক'রব? আমাদের মন-বুদ্ধির অতীত যে বস্তু, তাঁকে জানবার কোন উপায়ই থাকবে না—এই কি আমাদের সিদ্ধান্ত?

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভাবময়

ঠাকুর বলছেন, তা কেন? মন বুদ্ধি তাঁকে জানতে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ হচ্ছে। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপবার চেষ্টা করতে করতে ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। যেতে যেতে সেখানেই তার চরম শুদ্ধি হচ্ছে। তখন তার পূর্ব অস্তিত্ব—যে অস্তিত্বটি সীমিত, যার দ্বারা সে ব্যক্তিরূপে প্রতাত হচ্ছিল যার ফলে সে ব্রহ্ম থেকে নিজেকে পৃথক্‌রূপে দেখছিল, সে অস্তিত্বটি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। গেল কোথায়? আসল যা স্বরূপ, তাতেই লীন হ'য়ে গেল। এইভাবে সীমিত মন যখন সমস্ত সীমাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে তার স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তারই নাম 'বোধে বোধ হওয়া।'

ঠাকুর আর এক দিক দিয়ে কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছেন। "শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়ে আছে। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।" ঠাণ্ডা হচ্ছে ভক্তি; এক এক জায়গায় জল জমে বরফ হ'য়ে যায়। জল কি? না, ব্রহ্মসমুদ্র। ভক্তি হিমে জমে বরফ হ'য়ে গিয়েছে। জলের আকার নেই, কিন্তু বরফের আকার আছে। ঠাকুর বলছেন, এই বরফে জাহাজ চলে না, আটকে যায়—অর্থাৎ ভক্তের কাছে ভগবান্ সগুণ ও সাকার।

ডাঃ সরকার তার বিপরীত অর্থ ক'রে বলছেন, "ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়", অর্থাৎ তার অগ্রগতি হয় না। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, "হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে।" জাহাজ আটকে যায় যে বরফে, সে

বরফটি কি? সমুদ্রই তো। সমুদ্র তার একটি অবস্থায় বরফে পরিণত, সুতরাং আটকে গেলে সেই ব্রহ্ম ছাড়া আর কোথায় আটকাবে? আবার বলছেন, "যদি আরও বিচার করতে চাও·····তাতেও ক্ষতি নাই।" যদি বরফে আটকে যাওয়া তোমার পছন্দ না হয়, বিচার কর। বিচার জ্ঞান-সূর্য তাতে বরফ গলে যাবে। গলে গেলেও নষ্ট হ'ল কি? যা বরফরূপে ছিল, তা সমুদ্ররূপে রইল, দুই এক-ই বস্তু।

ভক্ত যে ভগবানকে সগুণ-সাকাররূপে উপলব্ধি করছেন জ্ঞানী তাঁকেই নির্গুণ-নিরাকার বলছেন। বস্তু এক—দুজন দুইরূপে অনুভব করছেন। কোন্‌টি সত্য? ঠাকুরের মতে দুই-ই সত্য। জ্ঞানী বলবেন, যার পরিবর্তন হয়, তা সত্য কি ক'রে হবে? ভক্ত বলবেন, পরিবর্তনশীল বস্তু অনিত্য, তোমার এ দৃষ্টান্ত জাগতিক সীমিত বস্তু সম্পর্কে, কিন্তু যে ভগবান জগতের মধ্যে সীমিত নন, তার ক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা কি চলে? অতএব তোমার দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার ভগবানকে মিথ্যা বলতে পার না। আমি তাঁকে অনুভব করছি, সেই রসে ডুবে আছি। তুমি তা পাওনি ব'লে তাঁকে মিথ্যা বলতে পার না। ঠাকুর সর্বভাবের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন—ভক্তের প্রতিও, জ্ঞানীর প্রতিও। ঝালে ঝোলে, অম্বলে—তিনি সবতাতেই আছেন। বলতেন, তাঁকে রূপে দেখব, অরূপে দেখব, সর্বরূপেতে তাঁকে আস্বাদন ক'রব। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য।